দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
ধৈর্যের অপরিহার্যতা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
ধৈর্যের অপরিহার্যতা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধৈর্যের অপরিহার্যতা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ৬০/- টাকা

যা বলতে চেয়েছি

ধৈর্য বা 'সবর' এমন এক দুর্লভ গুণ, এই গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে যেমন সফলতা অর্জন করতে পারে এবং পরকালের জীবনেও কল্যাণ লাভ করবে। এই গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করে থাকে। নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা তথা লালসা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিজেদের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ঝোঁক-প্রবণতাকে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। মহান আল্লাহর নিষেধমূলক কাজে, তাঁর অপসন্দনীয় কোনো কাজে তারা নিজেদেরকে জড়িত করে না। ঘুষ গ্রহণ করে অবৈধ পথে কাউকে কোনো সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দিলে, নৈতিকতা বিরোধী কোনো অবৈধ ব্যবসার সাথে নিজেকে জড়িত করলে প্রচুর অর্থ-বিত্তের অধিকারী হওয়া যায়, যাবতীয় অভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিলাসী জীবন-যাপন করা যায়, এসব সুযোগ সামনে উপস্থিত দেখেও ঈমানদার মহান আল্লাহর নির্দেশে ধৈর্য অবলম্বন করে পার্থিব সুযোগ-সুবিধার মাথায় পদাঘাত করে।

যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গিয়ে পার্থিব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, নিজের প্রভাব-প্রতিপতি হারিয়ে যায়, তবুও ধৈর্য অবলম্বন করে সততার পথেই অটল অবিচল থাকে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এবং পরকালের চিরস্থায়ী শুভ ফলের আকাংখায় পৃথিবীতে যাবতীয় অবৈধ কর্ম থেকে আত্মসংযম করে, পাপ-অপরাধের দিকে নিজের প্রবৃত্তির তীব্র আকর্ষণ ও ঝোঁক-প্রবণতাকে যারা 'সবর' নামক অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করে, এরা পরকালেও যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে, তেমনি এই পৃথিবীতেও সাধারণ মানুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ইসলাম তথা কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, তাদের চরিত্রে যে গুণটি থাকা সবথেকে বেশী অপরিহার্য, সে গুণটির নাম হলো ধৈর্য বা সবর। মানুষ যখন মিথ্যার বিপরীতে সত্যকে গ্রহণ করবে, পৃথিবীর যাবতীয় মিথ্যা আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি ত্যাগ করে একমাত্র সত্য আল্লাহর বিধান গ্রহণ করবে, সেই অনুসারে জীবন চালাবে এবং এই বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যা শক্তি সত্যের বাহকদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। নানা ধরনের নির্যাতন, নিষ্পেষন, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। এই অবস্থায় আল্লাহর বিধানের ওপর অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেবে। অসীম ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দ্বীনি আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেভাবে নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এগিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে ধৈর্য নামক দুর্লভ গুণের অধিকারী হবার তওফিক এনায়েত করুন।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

আলোচিত বিষয়

ধৈর্যের ব্যাপক ও সামগ্রিক অর্থ

ইসলাম তথা কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন, তাদের চরিত্রে যে গুণটি থাকা সবথেকে বেশী অপরিহার্য, সে গুণটির নাম হলো ধৈর্য বা সবর। মানুষ যখন মিথ্যার বিপরীতে সত্যকে গ্রহণ করবে, পৃথিবীর যাবতীয় মিথ্যা আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি ত্যাগ করে একমাত্র সত্য আল্লাহর বিধান গ্রহণ করবে, সেই অনুসারে জীবন চালাবে এবং এই বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যা শক্তি সত্যের বাহকদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। নানা ধরনের নির্যাতন, নিষ্পেষন, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। এই অবস্থায় আল্লাহর বিধানের ওপর অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেবে। অসীম ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দ্বীনি আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেভাবে নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এগিয়ে গিয়েছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ধৈর্য তথা 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদারদের গোটা জীবনই ধৈর্যের জীবন। ঈমানের পথে পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথেই তার ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা যেসব আদেশ দিয়েছেন, তা পালন করার ব্যাপারে ধৈর্যের প্রয়োজন। যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকার জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। নৈতিক অপরাধ ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা ও পরিহার করে চলাও ধৈর্যের প্রয়োজন। প্রতিটি পদে যে পাপের হাতছানি ও আকর্ষণ, তা থেকে দূরে অবস্থান করার জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। গভীর নিশীথে আরামের শয্যা ত্যাগ করে নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গেলে বৈষয়িক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এ অবস্থায় পরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গেলে বিপদ-আপদ, মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে আলিঙ্গন করতে হয়, এসব ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ব্যতীত সফল হওয়া যায় না এবং ঈমানও টিকিয়ে রাখা যায় না। ঈমান গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা থেকে শুরু করে নিজের পরিবারের লোকদের সাথে, সমাজের

সাথে, দেশের প্রচলিত আইনের সাথে এবং শয়তানের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ না করলে ঈমানের ওপরে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে হিজরাত ও জিহাদের প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়েও ধৈর্য নামক মহৎ গুণটির একান্ত প্রয়োজন। এই অবস্থায় একজন মুমিন একাকী বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তাকে প্রতি পদে পদে পরাজয় বরণ করার ঝুঁকি থেকে যায়। সফলতা অর্জন করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য একটি মুমিন সমাজ বা দলের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ধৈর্যশীল হয়, সমস্ত লোকগুলো পরস্পরকে ধৈর্যের প্রেরণা দিতে থাকে এবং মহাপরীক্ষার সময় তার পেছনে শীশাঢালা প্রাচীরের মতোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ঈমানদারদের সমাজ–দল বা সমাজের ও দলের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

তখন সেই সমাজ বা দলের গতি হয় অপ্রতিরোধ্য এবং দুর্বার। এক দুর্বিনীত অদম্য শক্তিতে ধৈর্যশীলদের সেই দল আত্মপ্রকাশ করে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণের সমাহার যে দলের কর্মীদের মধ্যে ঘটবে, একমাত্র সেই দলের পক্ষেই সম্ভব দেশের বুক থেকে অন্যায় অবিচার আর অনাচার ও পাপাচার দূর করা। সেই দলকে মহান আল্লাহ অবশ্যই বিজয় দান করবেন এবং দেশ ও জাতির নেতৃত্ব তাদেরকে দান করবেন। একদিন তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণহীন শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

সবর বা ধৈর্যের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অভিধানে 'সবর' শব্দের অনেকগুলো অর্থ করা হয়েছে। এই শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'বিরত রাখা, বাধা দেয়া।' আবার কোনো ক্ষেত্রে এর অর্থ করা হয়েছে, 'ইচ্ছার দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের পরিপক্কতা এবং এমন শক্তিকে প্রয়োগ করে লালসা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ করা, যার সাহায্যে একজন মানুষ নিজের প্রবৃত্তির তাড়না, কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে বা দ্বীনি আন্দোলনের পথে বাহ্যিক বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে না থেমে অব্যাহত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় যে শক্তির মাধ্যমে, তাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়।

যে কোনো ধরনের লোভ-লালসা এবং আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভাবধারাকে সংযত রাখাও 'সবর'-এর অন্তর্গত। অহেতুক ব্যাকুলতা প্রকাশ না করা, তাড়াহুড়া না করা, বিপদ

শঙ্কুল অবস্থা দেখে না ঘাবড়ানো, লোভ-লিপ্সা ও বাঞ্ছিত উত্তেজনা পরিহার করাও 'সবর'। ধীরস্থির মনোভাব সহকারে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সবরকারীদের অন্যতম গুণ। ঈমানদার ব্যক্তির সামনে বিপদ-আপদ ও কঠিন অবস্থা সম্মুখে এলে 'সবর' তার ভেতরে সচেতনতা সৃষ্টি করে দেয় এবং পদস্খলন থেকে তাকে মুক্ত রাখে। 'সবর' এমন একটি সুন্দর গুণ যে, তা উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থাতেও ক্রোধ ও রাগের তীব্রতা হ্রাস করে মানুষকে অবাঞ্ছনীয় কর্ম থেকে বিরত রাখে। বিপদের ঘন-ঘটা সমাচ্ছন্ন হয়ে এলেও এবং অবস্থার ক্রমিক অবনতি ঘটতে থাকলেও 'সবর' মানুষের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি ও জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত হওয়া থেকে হেফাজত করে। মানুষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অতি আগ্রহে দিশাহারা হয়ে অনেক সময় অপরিপক্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং সেই ব্যবস্থাকে সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত কার্যকরী মনে করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। 'সবর' এমন একটি উত্তম গুণ যে, মানুষকে এই অবস্থায় নিপতিত হওয়া থেকে ঢালের ভূমিকা পালন করে।

নিতান্ত বৈষয়িক স্বার্থ, বড় অঙ্কের মুনাফা বা লাভ, ভোগ-বিলাস ও আত্মতৃপ্তির আকর্ষণ অনেক সময় মানুষকে লোভাতুর বানিয়ে দেয়। এই অবস্থায় নিপতিত হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং মন-মানসিকতায় দুর্বলতা ছেয়ে যায়। 'সবর' এসব অবস্থা থেকে মানুষকে দূরে রেখে মূল লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে প্রত্যেক কদমে সবর করতে হয়। এই ময়দানে 'সবর' নামক গুণটির অভাব দেখা দিলে বা এই গুণের ভেতরে কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। আন্দোলনের সাথীদের সবার গুণ-বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা অনেক সময় পসন্দের বিপরীত হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাথীর কথাবার্তা ও আচার আচরণকে 'সবর' বা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। ধৈর্যের অভাব ঘটলেও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটবে, পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে। 'সবর'-এর অভাবে নিজেদের মধ্যে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে প্রতিপক্ষের সামনে টিকে থাকা যাবে না এবং ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلَا تَنَازَعُوْا

فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا-اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

হে ঈমানদারগণ! কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মোকাবেলা হয়, তখন দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্য সহকারে সব কাজ আঞ্জাম দিও, নিশ্চিত আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনফাল-৪৫-৪৬)

সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করাও 'সবর'

পৃথিবীতে মৌসুম পরিবর্তন হয় এবং এর মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য বিরাট কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। শীতের মৌসুমে গোটা প্রকৃতিতেই পরিবর্তনের একটি ধারা বইতে থাকে। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মানুষ, সবার দেহেই পরিবর্তনের সেই বাতাস ছোঁয়া দিয়ে যায়। বিশেষ করে মানুষের ত্বকে শুষ্কতা বিরাজ করে। অধিকাংশ উদ্ভিদ জগতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। উদ্ভিদ তার শ্যামলিমা হারিয়ে শুষ্ক আকার ধারণ করে। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে উদ্ভিদ জীর্ণতা ও শুষ্কতার আক্রমণ প্রতিহত করে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সৃষ্টির শুরু থেকেই এভাবে সর্বত্র পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। কোনো কিছুই চিরদিন একই অবস্থায় বিরাজ করে না। মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো ব্যক্তি বা জাতির জীবনেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রূপে বিদ্যমান থাকে না। এর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং এটাই মহান আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতি।

এক শ্রেণীর মানুষের অবস্থা হলো, তাদের জীবমে যখন কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটে, তখন তারা অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তাদের ভঙ্গি থাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিপূর্ণ। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করে, অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় ভাবতে থাকে। হাঁটা, চলাফেরা, ওঠা-বসায়, পোষাক-পরিচ্ছদে একটা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। পূর্বে সে কি ছিলো, কোন্ জীর্ণ দশা থেকে সে বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছে, এ কথা কল্পনা করার কষ্টটুকুও করতে চায় না। অহমিকা-দাম্ভিকতা, ক্ষমতা আর সম্পদের নেশায় সমস্ত কিছুকে নিজের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করতে চায়।

পক্ষান্তরে এই অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটে, বিপদ-মুসিবত তাকে গ্রাস করে, ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন তারা হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত

হয়। নিজের তকদিরকে ধিক্কার দিতে থাকে এবং আপন স্রষ্টার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি অভিশাপ দিতেও এদের বিবেকে বাধে না। কিন্তু যারা ঈমানদার এবং সালেহ্কারী ধৈর্যশীল, তাদের অবস্থান এমন হয় না। তাদের জীবনে কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটলে তারা মহান আল্লাহ্ প্রতি অধিক মাত্রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, গর্ব অহঙ্কারে তাদের বুক ফুলে ওঠে না। আবার হঠাৎ কোনো বিপদ-মুসিবত তাদের ওপর আপতিত হলেও তারা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে, পরম ধৈর্যের সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তারা সততার পথ অবলম্বন করে চলে। শুভ পরিবর্তনে গর্ব অহঙ্কারে ফেটে পড়া আর বিপদ মুসিবতে নিপতিত হলে হতাশাগ্রস্ত হওয়া, এই হীনতা ও নীচতা কেবলমাত্র তারাই মুক্ত, যারা 'সবর' নামক গুণ অর্জন করতে পেরেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ- أُوْلٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ-

এই ত্রুটি থেকে কেবল সেই লোকেরাই মুক্ত, যারা ধৈর্য অবলম্বনকারী এবং নেক আমলকারী। আর তারাই এমন যে, ক্ষমা ও বড় পুরস্কার তাদেরই জন্য রয়েছে। (সূরা হূদ-১১)

যেসব ব্যক্তি বা জাতি কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজেদের মন-মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, সময়ের পরিবর্তন তথা শুভ পরিবর্তন ঘটলে সাথে সাথে নিজের কথা, চলাফেরা, ব্যবহারে ও মন-মানসিকতা পরিবর্তিত করে না, দাম্ভিকতা অহঙ্কার প্রকাশ করে না, সর্বাবস্থায় এক যুক্তিসঙ্গত, সতত ও সুস্থ আচরণ রক্ষা করে জীবন পরিচালনা করে, তারাও ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত। অবস্থার অনুকূলে এবং অর্থ, ধন সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রশংসা-যশ ও জনবলের বিপুলতায় সামান্যতম অহঙ্কারের চিহ্নও প্রদর্শন করে না। আবার কোনো সময় বিপদ-মুসিবতে নিপতিত হয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ববোধকেও বিনষ্ট করে না। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নে'মাতের রূপ ধারণ করেই আসুক অথবা বিপদ মুসিবতের রূপেই আগমন করুক, সর্বাবস্থায় তারা সততার নীতি অবলম্বন করে ধৈর্য ধারণ করে–এই লোকগুলোকে মহান আল্লাহ ধৈর্যশীল, আমলে সালেহ্কারী এবং ক্ষমা ও পুরস্কারের যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

ধৈর্য ব। 'সবর' এমন এক দুর্লভ গুণ, এই গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে যেমন সফলতা অর্জন করতে পারে এবং পরকালের

জীবনেও কল্যাণ লাভ করবে। এই গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা সর্বাবস্থায় সততার নীতি অবলম্বন করে থাকে। নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা তথা লালসা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিজেদের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ঝোঁক-প্রবণতাকে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। মহান আল্লাহর নিষেধমূলক কাজে, তাঁর অপসন্দনীয় কোনো কাজে তারা নিজেদেরকে জড়িত করে না। ঘুষ গ্রহণ করে অবৈধ পথে কাউকে কোনো সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দিলে, নৈতিকতা বিরোধী কোনো অবৈধ ব্যবসার সাথে নিজেকে জড়িত করলে প্রচুর অর্থ-বিত্তের অধিকারী হওয়া যায়, যাবতীয় অভাব থেকে মুক্ত হয়ে বিলাসী জীবন-যাপন করা যায়, এসব সুযোগ সামনে উপস্থিত দেখেও ঈমানদার মহান আল্লাহর নির্দেশে ধৈর্য অবলম্বন করে পার্থিব সুযোগ-সুবিধার মাথায় পদাঘাত করে। যারা মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গিয়ে পার্থিব দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, নিজের প্রভাব-প্রতিপতি হারিয়ে যায়, তবুও ধৈর্য অবলম্বন করে সততার পথেই অটল অবিচল থাকে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় এবং পরকালের চিরস্থায়ী শুভ ফলের আকাংখায় পৃথিবীতে যাবতীয় অবৈধ কর্ম থেকে আত্মসংযম করে, পাপ-অপরাধের দিকে নিজের প্রবৃত্তির তীব্র আকর্ষণ ও ঝোঁক-প্রবণতাকে যারা 'সবর' নামক অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করে, এরা পরকালেও যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে, তেমনি এই পৃথিবীতেও সাধারণ মানুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সততার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের মানসিকতা বর্তমান অপরাধে নিমজ্জিত পৃথিবীতেও দেখা যায়। ঘুষখোর, অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী, আত্মসাৎকারী ও লোভী ব্যক্তিকে কেউ-ই সুদৃষ্টিতে দেখে না বা একান্ত বাধ্য না হলে কোনো মানুষ তার প্রশংসাও করে না। কিন্তু ধৈর্য অবলম্বন করে যারা এসব কাজের সুযোগ থাকার পরও অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সততাকে উচ্চে তুলে ধরে, সাধারণ মানুষের কাছে তারা সম্মান ও মর্যাদার পাত্রে পরিণত হন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সততা অবলম্বনকারী তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ-

তাদের অবস্থা এমন যে, নিজেদের রব-এর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তারা ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করতে থাকে আর অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা রা'দ-২২)

অন্যায়ের মোকাবেলা ন্যায় দ্বারা করাও 'সবর'

অহঙ্কারী ও দাম্ভিক লোকগুলো সাধারণত অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। অন্যের কোনো আচরণ বা কথা পসন্দ না হলে সাথে সাথে অহঙ্কারী ব্যক্তি হীন আচরণ করে মনে মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে যে, 'সে-ও ছেড়ে কথা বলেনি, প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।' পথ চলতে অসতর্কতা বশতঃ কারো দেহের সাথে ধাক্কা লাগলে এই শ্রেণীর লোকগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অধীনস্থ লোকদেরকে কোনো কাজের আদেশ করা হয়েছে। সে কাজ করতে ভুল করলো অথবা কাজটি করতে একটু দেরী হয়ে গেলো। অহঙ্কারী ধৈর্যহীন লোকগুলো তৎক্ষণাত্ত অধীনস্থদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে রূঢ় আচরণ করলো। অর্থাৎ এসব লোকদের মধ্যে ধৈর্যের বড়ই অভাব। ধৈর্যহীনতা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না, মানুষকে অকল্যাণের দিকেই নিক্ষেপ করে।

মহান আল্লাহর সন্তোষ অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা অন্যায়ের মোকাবেলা অন্যায় দিয়ে নয়—বরং ন্যায় ও পুণ্য কাজের মাধ্যমে করে। অপরাধের মোকাবেলা অপরাধ দিয়ে নয়, পাপের প্রতিবন্ধকতা পাপ দিয়ে নয়—সৎকাজ ও কল্যাণময় কাজের মাধ্যমে করে। ঈমানদার ধৈর্যশীল লোকদের ওপরে যারা জুলুম-অত্যাচার করে, তার জবাবে এরাও জুলুম-অত্যাচার করে না। তারা জুলুমের মোকাবেলা ইনসাফের মাধ্যমে করে। তাদের বিরুদ্ধে যতোই অশালীন ভাষা, মিথ্যাচার ও প্রচার মাধ্যমে অপবাদ ছড়ানো হোক না কেনো, এসবের জবাব দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে তারা সততা ও শালীনতার মাধ্যমেই জবাব দিয়ে থাকে। কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করলে তার সাথেও তারা অনুরূপ আচরণ করে না, বরং বিশ্বাসপরায়ণতাই প্রদর্শন করে।

মহান আল্লাহর সন্তোষ অনুসন্ধানে তৎপর ধৈর্যশীল লোকগুলো অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে করে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لاَتَكُوْنُوْا اِمَّعَةً-تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْنَا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ-اِنْ اَحْسَنَ اَنْ النَّاسُ اِنْ تَحْسِنُوْ وَاِنْ اَسَاؤْ اَفَلاَ تَظْلِمُوْا-

তোমরা নিজেদের কর্মনীতিকে অন্য লোকদের কর্মনীতির অনুসারী বানিও না। এমন বলা ঠিক নয় যে, লোকজন ভালো করলে আমরাও ভালো করবো আর অন্যেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো, বরং তোমরা নিজেদের মন ও নফসকে এক নিয়মের অনুসারী বানাও। লোকজন সৎকর্ম করলে তোমরাও সৎকর্ম করবে আর লোকজন অন্যায় করলেও তোমরা জুলুম করবে না।

আরেকটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার মালিক মহান আল্লাহ আমাকে নয়টি কথার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে চারটি নির্দেশ এমন যে, (১) আমি কারো প্রতি সন্তুষ্ট হই কি অসন্তুষ্ট–সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথাই বলবো। (২) যে আমার হক আত্মসাৎ করবে, আমি তার হক আদায় করবো। (৩) যে আমাকে বঞ্চিত করবে, আমি তাকে দান করবো। (৪) যে আমার ওপর জুলুম করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'

উল্লেখিত হাদীসে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা সবই 'সবর' বা ধৈর্যের সাথে সম্পর্কিত। ধৈর্যহীন লোকদের পক্ষে মহান আল্লাহর নির্দেশসমূহ কোনোক্রমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।' মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, 'তোমার সাথে যে ব্যক্তি কারবার করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না, তাকে শাস্তি দানের উত্তম পন্থা এই যে, তুমি তার সাথে আল্লাহকে ভয় করে কারবার করবে।'

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর নীতি ছিল, তিনি সব সময় ক্ষমতাসীন লোকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। নিজের কোনো প্রয়োজনেই তিনি কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের কাছে ধর্ণা দেননি। কিন্তু তৎকালীন শাসকবর্গ কামনা করতেন, তাঁর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রের শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শাসকদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করতেন। তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন লোক ছিল পেশায়

জুতার কারিগর। লোকটি প্রতিদিন রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে হট্টগোল করতো। এতে করে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) অসুবিধা অনুভব করলেও কখনো লোকটির প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করেননি।

একদিন রাতে তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রতিবেশী সেই লোকটির বাড়ি থেকে কোনো হট্টগোল শোনা যাচ্ছে না। দীর্ঘ দিন ধরে যা ঘটে আসছে, আজ তার ব্যতিক্রম দেখে তিনি প্রতিবেশীর বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, নেশাগ্রস্ত হয়ে হট্টগোল করার কারণে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লোকটিকে জেলখানায় বন্দী করেছে। তিনি কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলেন খলীফার দরবারে। যাঁকে অনুরোধ করেও খলীফার দরবারে আনা যায় না, সেই লোকটি স্বয়ং খলীফার দরবারে আসছেন, এটা দেখে খলীফা এবং তার সভাসদবৃন্দ অবাক হয়ে গেলেন। স্বয়ং খলীফা উঠে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, 'আপনি কেনো কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছেন, আমাকে সংবাদ দিলে আমিই আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সাথে দেখা করতাম।'

ইমাম বললেন, 'আমি আমার নিজের কোনো প্রয়োজনে আপনার দরবারে আসিনি। আমার একজন প্রতিবেশী পেশায় জুতার কারিগর। মদপান করে হট্টগোল করেছে আর সে কারণেই আপনার লোকজন তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করেছে। আপনি অনুগ্রহ করে তাকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দিন।'

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) তাঁর মদ্যপ প্রতিবেশীকে মুক্ত করে আনলেন। দিনের পর দিন লোকটির বিরক্তকর আচরণ ইমাম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। বাড়িতে ইমাম নামাযে দাঁড়িয়েছেন অথবা গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করছেন, এমন সময় লোকটি নেশাগ্রস্ত হয়ে হৈ-চৈ করেছে। তিনি অসুবিধা অনুভব করেছেন কিন্তু কখনো লোকটিকে তিরস্কার করেননি। লোকটির যাবতীয় অন্যায় আচরণ তিনি পরম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। ইতিহাস কথা বলে, সেই দিনের পর থেকে লোকটি আর কখনো মদ স্পর্শ করেনি। সহিষ্ণুতার এটাই উত্তম বিনিময়। ইমামের ধৈর্য ঐ মদ্যপ লোকটিকে চিরদিনের জন্যই মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করাও 'সবর'

অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করাও 'সবর'-কথাটি বর্তমান অসহিষ্ণু পরিবেশে লালিত-পালিত এক শ্রেণীর মানুষের কাছে অভিনব মনে হতে পারে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, এই অস্ত্র প্রয়োগ করেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্বর জাতির ওপরে সার্বিক দিক দিয়ে প্রধান্য বিস্তার করে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছেন, 'আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।' অসৎ কাজের মোকাবেলা সৎকাজ দিয়ে করার বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে পবিত্র কোরআনে সূরা হামীম সিজ্‌দায় এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ-اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَه عَدَاوَةٌ كَاَنَّه وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-وَمَا يُلَقّهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا-وَمَا يُلَقّهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

হে নবী! সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী এবং নবীর অনুসারীদেরকে মক্কায় কোন্ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আয়াতে নির্দেশ দিলেন যে, 'সৎকাজ এবং অসৎকাজ এক ধরনের নয়। অসৎকাজকে মিটিয়ে দিতে হবে সবথেকে উত্তম সৎকাজের মাধ্যমে।' শুধু তাই নয়, অসৎকাজকে সৎকাজের মাধ্যমে মোকাবেলা করলে এর শুভ পরিণাম কি হবে, সে কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'তুমি দেখবে, যারা তোমাকে চরম শত্রু মনে করতো, তারা তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাবে।' অসৎকাজকে সৎকাজের মাধ্যমে কারা মোকাবেলা করতে সক্ষম, তাদের গুণাবলীও জানিয়ে দিলেন যে, 'যারা অতিমাত্রায় ধৈর্যশীল, কেবল তাদের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব।' এই কাজ যারা করবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, 'এরা হলো ভাগ্যবান এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।'

উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে মক্কার সেই পরিস্থিতি সামনে রাখতে হবে, যে পরিস্থিতিতে এই নির্দেশ আল্লাহর নবীর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ কথা আমরা ইতিহাস থেকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সে সময় মুসলমান হবার অর্থই ছিলো, অর্থই ছিলো নিজেকে ব্যঘ্র-সিংহ তথা হিংস্র বন্য প্রাণীর মুখে

নিজেকে সোপর্দ করা। তখন যে ব্যক্তিই মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করতো, তখনই সহসা অনুভব করতো যেন সে হিংস্র শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করেছে আর হিংস্র প্রাণীগুলো দন্ত-নখর বিস্তার করে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য তার দিকে ছুটে আসছে। মুসলমান হবার কারণে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, রাস্তা-পথে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হচ্ছে, কোথাও প্রাণের নিরাপত্তা থাকছে না। এরপরেও মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ অবতীর্ণ হলো, 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো এবং ঘোষণা করলো, 'আমি মুসলমানদের একজন।'

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী নির্যাতনের এমন কোনো পন্থা নেই যা তারা প্রয়োগ করেনি। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূলের অনুমোদনক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশত্যাগ করে ভিন্ন দেশে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেও তাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেয়া হয়নি। মক্কা থেকে ইসলাম বিরোধী লোকগুলো সে দেশে গিয়ে সে দেশের শাসকবর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। চরম হঠকারিতা ও আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করা হচ্ছিলো। আর বিরোধিতার ক্ষেত্রে মানবতা, ভদ্রতা ও নৈতকতার সর্বশেষ সীমাও ধৃষ্টতার সাথে লঙ্ঘন করা হচ্ছিলো।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পিত অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিলো। আল্লাহর রাসূলকে অপমান-অপদস্থ করা, তাঁর সম্পর্কে দেশ-বিদেশের লোকদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যে যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও কলা-কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছিলো। বর্তমান যুগে যেমন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত সংগঠন ও এর সাথে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে সাম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সে যুগেও একদল লোককে এই দায়িত্ব দিয়েই ময়দানে সক্রিয় করা হয়েছিলো, যারা আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করবে।

শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে নির্যাতনের যতগুলো ঘৃণিত পন্থা সে সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিলো, তার সবগুলোই ইসলামপন্থীদের ওপরে নির্মমভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিলো। একদল লোককে রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো, যারা দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াতী কাজে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে যে কোনো ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করতো। রাসূল যখনই কোনো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত

দিতেন, বা কোনো সমাবেশে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের কথা বলতেন, অমনি সেখানে এমন হট্টগোল সৃষ্টি করা হতো, যেন সাধারণ মানুষ আল্লাহর দ্বীনের কথা শুনতে না পারে। এভাবে করে এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিলো যে, দাওয়াতী কাজের সফলতা সম্পর্কে হতাশা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো আশা পোষণ করার উপায় ছিলো না।

ঠিক এই পরিবেশে রাসূল ও তাঁর সাথীদেরকে মহান আল্লাহ দিক নির্দেশনা দিয়ে জানিয়ে দিলেন, প্রতিপক্ষ যে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করছে, যে ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডে তারা লিপ্ত, যে দুষ্কর্ম তারা করছে, তাদের ঘৃণিত দুষ্কর্ম এর তোমাদের সৎকর্ম কখনোই সমান নয়। যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে, তাদের অপকর্ম আর তোমাদের অনুসৃত সৎনীতি ও সৎকর্ম সমান্তরাল নয়। যদিও তোমাদের সৎকর্ম বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত। কিন্তু এ কথা তোমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, বর্তমানে সৎকর্ম ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত হলেও এর ভেতরে এমন শক্তি লুকায়িত রয়েছে, যা উপযুক্ত পরিবেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করে যাবতীয় অসৎকর্মকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভষ্ম করে নিঃশেষ করে দেবে। আর দুষ্কর্মের নিজ দেহে এমন দুর্বলতা বিদ্যমান, অসৎকর্মের নিজ দেহ এমন ক্ষয় রোগে আক্রান্ত যে, নিজের রোগ যন্ত্রণায় অসৎকর্ম স্বয়ং আত্মহত্যা করতে বাধ্য। অর্থাৎ অসৎকর্মের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণেই তা স্বয়ং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং ইতোপূর্বে তাই হয়েছে।

কারণ মানুষের ভেতরে সৃষ্টিগতভাবেই এমন এক প্রকৃতি বিদ্যমান রয়েছে যে, যে প্রকৃতি অসৎকর্মকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। অসৎকর্ম যারা করে এবং যারা তার সহযোগী শক্তি, তাদের চেতনার জগতেও এ কথা জাগ্রত থাকে যে, তারা যা করছে তা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অসত্য। তাদের এই অন্যায় কর্মকান্ডের বিনিময়ে অন্য লোকদের মনে তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হবে; এই আশা তারা নিজেরা পোষণ করা তো দূরে থাক, বরং নিজেদের কর্মকান্ডের কারণে নিজের বিবেকের কাছে তারা লজ্জিত থাকে, যদিও বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে সে লজ্জা তারা প্রকাশ পেতে দেয় না। এভাবে অসৎকর্মশীল লোকদের মনে এমন এক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যে শক্তি তার অসৎ ইচ্ছা ও সঙ্কল্পকে প্রতি মুহূর্তে দুর্বল করতে থাকে।

এই অবস্থায় ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত সৎকর্ম বিরতিহীনভাবে তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই অসৎকর্মের ওপরে সৎকর্ম বিজয়ী হয়। কারণ সৎকর্ম

স্বয়ং এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যা মানুষের মানস জগতে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রাণের দুশমনকেও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত করে। প্রাণের দুশমন তার প্রতিপক্ষের সৎকর্মের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়–প্রত্যেক যুগের ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করেছে। সৎকর্মশীল লোকগুলোর সাথে যখন অসৎকর্মশীল লোকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং তা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে, তখন এই উভয় দলের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের ভেতরে যারা অসৎকর্মশীল লোকদেরকে সমর্থন করতো, তারাও অসৎকর্মে লিপ্ত লোকদের বিভৎস গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখে তাদেরকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয় এবং সৎকর্মশীলদের লোকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সৎকর্মশীল এবং তাঁরা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত ছিলেন। আর প্রতিপক্ষ ছিলো অসৎকর্মশীল এবং তারা বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সক্রিয় ছিলো। বছরের পর বছর ধরে উভয় দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংঘাত চললো। রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী যে কোনো ধরনের অসৎকর্মের জবাব সৎকর্মের মাধ্যমেই দিতে থাকলেন। আর অসৎকর্মশীল লোকগুলো প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার আশায় তাদের যাবতীয় ঘৃণ্য উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে নিজেদের নিকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিলো। ফলে সাধারণ মানুষের ভেতরে তাদের প্রতি এক অবিমিশ্র ঘৃণা সৃষ্টি হলো এবং অসৎকর্মশীল লোকগুলোর ভেতর থেকে একটি বিরাট সংখ্যক লোক ক্রমশ নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করে নিজ দল ত্যাগ করে সৎকর্মশীল লোকদের দলে গিয়ে শামিল হতে থাকলো।

এভাবেই অসৎকর্ম নিজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলো এবং শেষ পর্যন্ত অসৎকর্মের ওপরে সৎকর্ম বিজয়ী হলো। কিন্তু এই বিজয় এক দিনে বা এক বছরে আসেনি। এই বিজয় অর্জন করার জন্য প্রয়োজন পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার। সময় যতো গড়াতে থাকে, অসৎকর্মের অভ্যন্তরীণ নোংরামী ততোই তার দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। এই দুর্গন্ধে এক সময় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে অসৎকর্মের উৎসমূলকে উৎখাত করে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে।

সূরা হামিম সিজ্দার উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসৎকর্মের মোকাবেলা শুধুমাত্র সৎকর্মের মাধ্যমেই করতে বলেননি, বলেছেন

সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে। পবিত্র কোরআনের গবেষকগণ এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির সাথে যদি কেউ অন্যায় আচরণ করে আর সে ব্যক্তি যদি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা হলো শুধুমাত্র সৎকর্ম। আর অন্যায় আচরণ যার সাথে করা হলো, সেই ব্যক্তি যদি অন্যায় আচরণকারীকে ক্ষমাও করে দিলো এবং সুযোগ বুঝে তার উপকারও করলো, এটাই হলো সর্বোত্তম সৎকর্ম। অর্থাৎ অন্যায়কারীকে শুধু ক্ষমাই করা হলো না, তার প্রতি অনুগ্রহও করা হলো। এভাবেই অসৎকর্মের মোকাবেলা সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে করা হলো।

এই কাজের শুভ পরিণতি কি দাঁড়াবে, সে কথাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'অসৎকর্মের মোকাবেলা যদি সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে করা হয়, তাহলে প্রাণের শত্রুও এক সময় পরম আপনজনে পরিণত হবে।' এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই এই গুণটি নিহিত রয়েছে। একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, যার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি সবকিছু জেনে শুনেও নীরব থাকে তাহলে অবশ্যই এটা সৎকাজের মধ্যে গণ্য হবে–কিন্তু তার এই সৎকাজ কটুবাক্য প্রয়োগকারীকে তার হীন কর্ম থেকে বিরত করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি কটুবাক্য প্রয়োগকারীকে তিরস্কার না করে তার কল্যাণ কামনা করে, সুযোগ পেলে তার উপকার করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নিজের বিবেকের কাছে লজ্জিত হবে এবং হীন কর্ম থেকে নিজেকে বিরত করবে।

পৃথিবীতে এমন ধরনের মানুষও রয়েছে, যারা প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার সামান্য সুযোগও হাতছাড়া করে না। এরা সবসময় প্রতিপক্ষের দুর্বলতা অনুসন্ধান করতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই ক্ষতি করে। অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করতে হবে–এই নীতি অনুসরণ করে সে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকলো। প্রতিপক্ষ এই নীরবতাকে দুর্বলতা মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন সুযোগ যদি আসে যে, শত্রু লোকটি মারাত্মক বিপদে পড়েছে, এই অবস্থায় তার দ্বারায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি তার শত্রুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে গেলো। এই পরিস্থিতিতে শত্রুতায় লিপ্ত লোকটির পক্ষে পুনরায় কোনো ধরনের

ক্ষতিকর কাজ করা তো দূরে থাক, সে বরং পরম আপনজনে পরিণত হবে এতে কেনো সন্দেহ নেই। তবে সর্বক্ষেত্রে এই নীতি অবলম্বন করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম কোন্ পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে শত্রুর শত্রুতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই 'অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্ম দিয়ে করার' নীতি অবলম্বন করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল মক্কী জীবনে এই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং সেটা ছিল ঐ নীতি অবলম্বনের উর্বর ময়দান। কিন্তু মদীনার জীবনে সবর্ত্র আল্লাহর রাসূল ঐ নীতি অবলম্বন করেননি এবং সেই ময়দান ঐ নীতি অবলম্বনের অনুকূল ছিল না। মদীনার ও খায়বরের ইহুদীদের অসৎকর্মের জবাব আল্লাহর রাসূল দীর্ঘদিন যাবৎ সৎকর্মের মাধ্যমে দিয়েছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ রাসূলের এই নীতিকে দুর্বলতা মনে করে ইসলামী রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত থেকেছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিয়েই দিতে হয়েছে।

সুতরাং সর্বোত্তম সৎকর্মের মাধ্যমে যে কেনো ধরনের দুশমন অনিবার্যভাবে পরম আপনজনে পরিণত হয়ে যাবে, এই ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ পৃথিবীতে এমন নিকৃষ্ট ও জঘন্য মানুষের অস্তিত্বও রয়েছে, যাদের অসৎকর্মের জবাব সৎকর্মের মাধ্যমে দিলে, তাদেরকে ক্ষমা করলে এবং তাদের উপকারের জন্য সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিলেও তারা এগুলোকে দুর্বলতা মনে করে কয়েকগুণ উৎসাহের সাথে শত্রুতা করতেই থাকে। এসব নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোকদের অপকর্মের জবাবে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ যে পন্থায় দিয়েছেন, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে সেই পন্থাই গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাবুকের ইতিহাস দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় আল্লাহর রাসূল যদি সে সময় তাবুকের প্রান্তরে বিপুল শক্তির সমাবেশ না ঘটাতেন, তাহলে প্রতিপক্ষ ইসলামী শক্তিকে নিতান্তই দুর্বল ভেবে চারদিক থেকে স্রোতের মতোই ইসলামের ওপরে আছড়ে পড়তো।

অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা, এটা কোনো মামুলি বিষয় নয়। এই কাজ করতে হলে অসীম সাহস, দৃঢ় মনোবল, অপরিবর্তনীয় সঙ্কল্প, নিজেকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং যাদের রয়েছে অপরিসীম সহনশীলতা, তাদের পক্ষেই অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা সম্ভব। মুসলিম

হত্যাযজ্ঞের মহানায়ক নরঘাতক রিচার্ড–যে রিচার্ড হাজার হাজার মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-তরুণকে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল, যার সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক 'লেনপুল' তার বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত' বলে। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক 'গিবন' চিহ্নিত করেছেন, 'শোণিত পিপাসু' হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায় রিচার্ড হলো, 'মানব জাতির নির্মম চাবুক'। যুদ্ধের ময়দানে এই নরঘাতকের অস্ত্র যখন ভেঙ্গে গিয়েছিল, মানবতার বন্ধু সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী তখন তাকে হত্যা না করে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নরপশু রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার খৃষ্টান সাথীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তখন মুসলিম বীর সালাহ্ উদ্দিন গোপনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর নাম অসৎকর্মকে সৎকর্মের মাধ্যমে মোকাবেলা করা।

সাময়িকভাবে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অসৎকর্মের মোকাবেলা সৎকর্মের মাধ্যমে করা সম্ভব হলেও কঠিন সঙ্কল্প ও অপরিসীম সহনশীলতা সহকারে জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে প্রত্যেক পদক্ষেপে এই নীতি বাস্তবায়ন করা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই কাজ কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব, যারা 'হক'-এর দাওয়াতী কাজকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে এবং এই পথের প্রত্যেক বাঁকে ওৎ পেতে থাকা বিপদ-মুসিবতকে মোকাবেলা করার মতো 'সবর বা ধৈর্য' নামক বর্মে নিজেকে আবৃত করেছে।

কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত লোকদেরকে ইসলাম বিরোধী এমন ধরনের নিকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়, যারা ন্যায়-নীতি, সততা, নৈতিকতা, সুন্দর আচরণ, ভালো ব্যবহার, উত্তম কথা তথা কোনো ধরনের সৎ গুণের তোয়াক্কা করে না। দাম্ভিকতা, মুর্খতা ও অহঙ্কার যাদের চরিত্রের ভুষণ, তাদের অপকর্মের মোকাবেলা শুধুমাত্র সৎকর্ম দিয়েই নয়–সর্বোত্তম সৎকর্ম দিয়ে করা ঐ লোকগুলোর দ্বারাই সম্ভব, যারা প্রত্যেক পদে রাসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্পবদ্ধ। মক্কায় অবস্থানকালে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছিলো, মক্কা বিজয়ের পরে সেই অত্যাচারী লোকগুলো যখন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীদের সামনে অপরাধীর ভঙ্গিতে উপস্থিত ছিলো, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীরা সামান্য কটুবাক্যও তাদের প্রতি প্রয়োগ করেননি।

এর নামই 'সবর বা ধৈর্য' এবং এই গুণকে নিজ চরিত্রের ভূষণে পরিণত করতে ব্যর্থ হলে দাওয়াতী কাজ যেমন সফলতা অর্জন করতে পারবে না, তেমনি মহান আল্লাহর দরবারে সেই সম্মান ও মর্যাদাও লাভ করা যাবে না, যে সম্মান ও মর্যাদা মহান আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদেরকে দান করবেন। দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত প্রত্যেকটি লোককে এই 'সবর বা ধৈর্য' নামক গুণ অর্জন করতে হবে, যারা এই গুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি তাদের সফলতা ও কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করে যে, পৃথিবীতে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করলে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করা গেলেও পৃথিবীর জীবনে কিছুই পাওয়া যাবে না–এই ধারণা মারাত্মক ভুল। কারণ এই নীতি অবলম্বন করলে কেবলমাত্র পরকালের জীবনেই সফলতা আসবে তা নয়, পৃথিবীর জীবনেও সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি লাভ করা যায়। যেসব লোক প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্কারী, কোনো ব্যাপারেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না, লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অবলম্বন করে, মানুষকে অর্থ, শক্তি, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে উপকার করে, তারা মানুষের কাছে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করে। সাধারণ মানুষ তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। এই ধরনের কোন্ লোক বিপদে নিপতিত হলে সমাজের সবথেকে খারাপ লোকটিও তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ধৈর্য অবলম্বনকারী সৎলোকগুলো অভাবের মধ্যে থেকেও যে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, তা দুষ্কৃতিতে নিমজ্জিত রাজপ্রাসাদের অধিকারী লোকগুলো লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধৈর্য অবলম্বনকারী লোকগুলোকে এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। (সূরা নাহ্ল-৯৬)

ধৈর্যশীলদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ

ঈমানদার কখনও ধৈর্যহীন হয় না, তাঁর ঈমান তাকে ধৈর্যহীন হতে দেয় না। ধৈর্যহারা তারাই হয়, যাদের কোন অভিভাবক নেই। যাদের ওপরে কোন শক্তি নেই, যারা আশ্রয়হীন, যাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই তারাই কেবল ধৈর্যহীন হতে পারে। কিন্তু ঈমানদার বান্দা জানে যে, তার অভিভবাক হলেন সমস্ত ক্ষমতার

অধিশ্বর স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারায় বলেছেন–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا–يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ–

যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনেন।

মুমীন বান্দা জানে, তাঁর রুজির মালিক হলেন আল্লাহ। 'হক'-এর পথ অবলম্বন করলে তার রুজির ওপরে আঘাত আসতে পারে, তার সন্তান-সন্ততি অনাহারে থাকতে পারে, এ ধরনের চিন্তায় ধৈর্যহারা হয়ে সে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ–

বলো, আমি আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নেব কি ? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুজী দান করেন, রুজী গ্রহণ করেন না ? (সূরা আন'আম–১৪)

মুমীন বান্দারা বলে, আমি কি সেই আল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করে, তার বিধান অমান্য করে মানুষের বানানো বিধান ও আইন-কানুনের সামনে মাথানত করবো, যিনি ঐ বিশাল আকাশ সৃষ্টি করে তা সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন, যিনি এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন, প্রাণীকুলের আহার যিনি দিচ্ছেন, তার আইন বাদ দিয়ে আমি অন্য কারো আইন মানতে পারি না। কারণ আমার আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আদেশ দিয়েছেন–

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

সেই বিধানই অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতি তোমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তোমরা নিজেদের রব-কে বাদ দিয়ে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষককে অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ–৩)

ঈমান মানুষের ভেতরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় যে, সবচেয়ে উত্তম বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাঁর আল্লাহ তাঁকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন–

وَاِنْ تَوَلَّوْافَاعْلَمُوْااَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ-نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ-

জেনে রেখো, আল্লাহ-ই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক; তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও বন্ধু। (সূরা আন্‌ফাল-৪০)

ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আল্লাহর মোকাবেলায় এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। সূরা তওবার ১১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ-يُحْىٖ وَيُمِيْتُ-وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ-

অবশ্যই আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তোমাদের কোনো সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন নেই, যে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

ঈমানদার হয় সহনশীল-সবরকারী এবং তার ভেতরে মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। একজন মানুষ গোনাহ্ করবে এটাই স্বাভাবিক। গোনাহ্ করার কারণে মুমীন আল্লাহর ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। এ অবস্থায় শয়তান এসে তাকে এ কথা বলে প্রতারিত করতে চায় যে, 'তোমার আর কোনো উপায় নেই, তুমি এত গোনাহ্ করেছো যে, এই গোনাহ্ তোমাকে অবশ্যই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।'

এভাবে প্রতারণা করে মুমীনকে হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করার অপচেষ্টা করে শয়তান। কিন্তু ঈমানদার বান্দাকে শয়তান এ জন্য প্রতারিত করতে পারে না, কারণ সে জানে যে, অপরাধ করেছে সে, আর তার আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী। ক্ষমা করতে তিনি ভালোবাসেন। সে যে গোনাহ্ করেছে, তার এই গোনাহের থেকে আল্লাহর রহমত অনেক বড়। সেই আল্লাহই পবিত্র কোরআনে বলেছেন-

لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ- আমার রহমত থেকে কখনও হতাশ হবে না।

মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাকে জানিয়েছেন, আমার রহমত থেকে মুহূর্তের জন্যও নিরাশ হবে না। তুমি যদি পাহাড় সমান গোনাহ্ করে থাকো, তাহলে জেনে রেখো, আমার রহমত পাহাড়কে অতিক্রম করে আকাশে পৌঁছে যাবে। আর তোমার গোনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় তাহলে আমার রহমত আমার আরশে আযীম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

সুতরাং গোনাহ্ করলে আল্লাহর কাছে তওবা করে ক্ষমা চাইলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন–এই বিশ্বাস মুমীন অন্তরে পোষণ করে। ঈমানদারের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি হলেই সে নামাযে দাঁড়িয়ে যায় এবং নামাযের মাধ্যমেই সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে। সবর বা ধৈর্য হলো অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ। সবরই হলো সকল প্রকার সাফল্য ও সার্থকতার চাবিকাঠি। সবর ব্যতীত কোনো মানুষই কোনো ধরনের কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারায় বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ–وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ–وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ–اَلَّذِيْنَ اِذَ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ–اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ–

হে ঈমানাদরগণ! ধৈর্য ও নামাযে সাহায্যে প্রার্থনা করো, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোনো চেতনা হয় না। আমি নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনাহার, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে, এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলবে, 'আমরা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ্ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, আল্লাহর রহমত তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথের যাত্রী।

হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

কোন ধরনের দূরারোগ্য রোগে ঈমানদার আক্রান্ত হলে সে ধৈর্যহারা হয় না। রোগের কারণে সে নিরাশ হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণে না। তার মনের ভেতরে এ আশা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, আল্লাহ তাঁর রোগ অবশ্যই ভালো করে দেবেন।

এভাবে ঈমান মানুষের ভেতরে মানসিক প্রশান্তি আর ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মূর্তি পূজায় লিপ্ত তাঁর জাতিকে বলেছিলেন

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ-وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ-وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ-وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ-وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ-

তোমাদের ঐ মূর্তিগুলো তো আমার শত্রু আর আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ–যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি যখন ক্ষুধার্ত হই তখন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং আমি যখন তৃষ্ণার্ত হই তখন তিনি আমাকে পান করান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জীবন দান করবেন। আমি তাঁর কাছেই আশা পোষণ করি যে, বিচারের দিনে তিনি আমার ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা শূ'আরা–৭৭-৮২)

সুতরাং কোনো ঈমানদার যখন দীর্ঘস্থায়ী রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে তখন সে মুহূর্তের জন্যও ধৈর্যহীন হয় না। ধৈর্যহারা তো হয় সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নিজের প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করে না। যে ব্যক্তি কাফের–সেই কেবল আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হতে পারে––ধৈর্যহারা হতে পারে। হতাশা ব্যক্ত করা, নিরাশ হওয়া ও ধৈর্যহীন হওয়া হলো কুফ্‌রী। ধৈর্যহীন হওয়া––হতাশা ব্যক্ত করা, নৈরাশ্য প্রকাশ করা ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ।

হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালামের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, অকল্পনীয় রোগ যন্ত্রণায় তিনি দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁর গোটা শরীরে পচন ধরেছিল, তা থেকে যে দুর্গন্ধ নির্গত হতো, ফলে কোনো মানুষ তাঁর পাশে যেতে পারতো না। গোটা শরীরে রক্তাক্ত ক্ষত, তার ভেতরে পোকা বাসা বেঁধেছে। একদিকে রোগ যন্ত্রণা অপরদিকে পোকার কামড়ে তিনি জর্জরিত। তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। প্রতিবেশীগণ সহ্য করতে পারলো না। তাঁকে এলাকা থেকে বের করে দেয়া হলো। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় স্বজন তাকে ত্যাগ করলো। তবুও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না।

নেই–কোথাও কেউ নেই তাঁকে এতটুকু সাহায্য করার। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি হতাশ বা ধৈর্যহারা হননি। নিরাশা—হতাশার ও ধৈর্যহীনতার সামান্যতম চিহ্নও তাঁর রোগাক্রান্ত চেহারায় প্রতিভাত হয়নি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিন্দু পরিমাণ স্থান তাঁর দেহে অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে রোগ আক্রমণ করেনি। অবশেষে রোগ যখন তাঁর জিহ্বায় আক্রমণ করলো, জিহ্বায় পচন দেখা দিল তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যাকুলতা রোগের কারণে ছিল না। তাঁর ব্যাকুলতা এ জন্য ছিল যে, মুখের ভেতরে জিহ্বাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি ঐ মহান আল্লাহর নাম কী ভাবে উচ্চারণ করবেন ! এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি কী ভাবে আল্লাহকে ডাকলেন, আল্লাহর কোরআন আমাদেরকে তা শোনাচ্ছে–

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ–

স্মরণ করো, যখন সে তার রব-কে ডাকলো, আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী। আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করেছিলাম এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং সেই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য। (সূরা আম্বিয়া-৮৩-৮৪)

হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামের দোয়ার ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন, 'তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' পরে কোনো অভিযোগ ও নালিশ নেই, দোয়ার এই ভঙ্গিমা যে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোনো পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোনো পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, 'আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।' এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং

তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলেন। সূরা সাদ-এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বললেন–

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ-هٰذَا مُغْتَسَلٌ ۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ-

নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এতে ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য। (সূরা সা-দ-৪২)

এই আয়াত থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন। সে ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময় এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোন মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল।

হযরত আয়ুব আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকলে মহান আল্লাহ উল্লেখ করতেন। যতটুকু মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ততটুকু মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। তিনি এক মহান পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁর সে ভূমিকা সম্পর্কে মহান আরশে আজিমের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সনদ দান করেছেন যে, তাঁর এই ভূমিকা চিন্তাশীলদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। সূরা সাদ-এর ৪১-৪২ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا-نِعْمَ الْعَبْدُ-اِنَّهٗ اَوَّابٌ-

আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রব-এর অভিমুখী।

উল্লেখিত আয়াতে হযরত আয়ুব আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বর্ণনা করার পূর্বে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, আমি সোলাইমানকে অগণিত নে'মাত দানে ধন্য করেছিলাম। কিন্তু সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি এবং আমাকে ভুলে যায়নি। কখনো সে অহংকার করেনি। এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ এবং ধৈর্য তাঁর কাছে ততো বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উলটো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা ইবলিস, ফেরাউন, নমরুদ,

কারুণসহ যুগের বা শতাব্দীর ফেরাউনদের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে তওবা করে দীনতা সহকারে তার রব-এর সামনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতোপূর্বে দাউদ আলাইহিস সালাম ও সোলাইমান আলাইহিস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়েছে। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম ইস্‌তিগ্‌ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জ্বিনদের ওপর কর্তৃত্ব এবং দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

এরপরেই হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আমি যেমন সোলাইমানকে নে'মাত দান করে পরীক্ষা করেছিলাম, সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল ঠিক তেমনি আয়ূবের কাছ থেকে সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে রোগগ্রস্থ করে পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। সে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। যখন সে প্রচুর নে'মাত লাভ করেছিল, তখনও সে কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি, আবার যখন তার কাছ থেকে ধন-দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাঁর আপনজনরা রোগের কারণে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, কঠিন রোগ তাকে দিনের পর দিন সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, তখনও সে আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়নি। ধৈর্যহীন হননি এবং নিরাশ হয়ে হতাশা ব্যক্ত করেননি। উভয় অবস্থাতেই সে আমার শোকর আদায় করেছে–আমার রহমতের ওপরে আশাবাদী থেকেছে।

বুখারী হাদীসে কিতাবুল আম্বিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো একদিন হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালাম গোছল করছিলেন। এমন সময় স্বর্ণের তৈরী পঙ্গপাল তাঁর শরীরের ওপরে এসে আছড়ে পড়তে থাকে। তিনি তা দ্রুত হাতে ধরে নিজের কাপড়ের ভেতরে জমা করতে থাকেন। এ সময় মহান আল্লাহ তাকে ডাক দিয়ে বলেন, হে আয়ূব! তুমি দেখতে পাচ্ছো, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি?

অর্থাৎ আমি তো তোমাকে প্রচুর দান করেছি, তবুও কেনো এসব স্বর্ণের পঙ্গপাল ধরে জমা করছো? আল্লাহর নবী হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে রাব্বুল আলামীন, তুমি আমাকে অনেক দান করেছো, কিন্তু এরপরেও তো তোমার রহমত ও বরকত হতে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না।

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আয়ূব আলাইহিস্ সালাম প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আবার এক সময় তিনি একেবারে কপর্দক শুন্য হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি তাঁকে ত্যাগ করেছিল, পরীক্ষায় সফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরে মহান আল্লাহ তাঁকে পুনরায় সমস্ত কিছুই দান করেছিলেন।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।'

কোরআনের বর্ণনার অর্থ এটা নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচন্ডতা, ধন-সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে হুকুম দিলাম তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।'

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল হযরত আয়ূব আলাইহিস সালামের জন্য তাঁর রোগের চিকিৎসা।

কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো।' হাদীস থেকে জানা যায়, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর হযরত আয়ূব আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল এমন কি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাঁকে আরো সন্তান দান করলাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো, নিজের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।'

অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, সুসময়ে অনুকূল অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভাল-মন্দ সরাসরি একমাত্র ঐ আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে একেবারে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে একেবারে চরম দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় উপনীত করতে পারেন। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য হলো, যে কোনো অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহীন হওয়া উচিত নয়। ধৈর্যহীন হওয়া ও হতাশা ব্যক্ত করা বড় ধরনের গোনাহ্।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

ঈমানদার ব্যক্তি কখনও বিপদে ধৈর্য হারায় না। জীবনের চরম মুহূর্তে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। যে কোন ধরনের বিপদই আসুক না কেন, ঈমানদার আল্লাহর ওপরে ভরসা করে। এটা হলো ঈমানের বাস্তব উপকারিতা। ঈমান মানুষের ভেতরে ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। কারণ ঈমানদার এ কথা জানে যে, বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জীবনের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তাঁর অন্যান্য ভাইগণ তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি গর্তে নিক্ষেপ করলো। জীবনের এই চরম মুহূর্তেও তিনি অস্থির হননি। এতটুকু ধৈর্যহারা হননি। তাঁর এই বিপদের মধ্যে কতবড় কল্যাণ যে নিহিত ছিল, তখন তিনি যেমন অনুভব করতে পারেননি তেমনি উপলব্ধি করতে পারেনি তাকে যারা হত্যা করার উদ্দেশ্যে গর্তে নিক্ষেপ করেছিল তারাও।

কেনান শহরের একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করা হলো, এরপর তিনি গিয়ে পৌঁছলেন সুদূর মিশরে। সেখানে তিনি প্রথমে হলেন সে রাষ্ট্রের অর্থ ও খাদ্যমন্ত্রী এবং তারপরেই তিনি সেদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন। তাঁর ওপরে যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, সে বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু বিপদ যখন মুখ

ব্যাদন করে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পৃথিবীর আলো-বাতাস তিনি আর কোনদিন দেখতে পাবেন, ভোগ করতে পারবেন, মুক্ত আলো-বাতাসে তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, এমন কোন আশা-ই যখন ছিল না, তখনও তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলোর অবস্থা তেমনি হতে হবে। তাহলেই কল্যাণ লাভ করা যাবে–তার পূর্বে নয়।

মিশরেও উপনীত হয়ে বিপদ তাঁর পিছু ত্যাগ করলো না। অপূর্ব সুন্দর চেহারার কারণে একশ্রেণীর নারীর দল তাঁকে কলুষিত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলো। তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হলো তখন তাঁর ওপরে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলো। এখানেও তিনি ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। প্রকৃতপক্ষে নীতি নৈতিকতা বিরোধী এবং আল্লাহ বিরোধী কোন কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হবার পূর্বে ঈমানদার–আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এমন স্থানকেই অধীক প্রাধান্য দান করেন, যে স্থান সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা থাকে যে, সেখানে তাকে চরম কষ্টের মধ্যে দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হবে। সেখানে যতই কষ্ট হোক না কেন, এমন কাজ করতে ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই রাজী হবে না, যে কাজ করে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যাবে না। এ কারণেই নবী রাসূল ও তাদের দৃঢ় অনুসারী দ্বীনি আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলো প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুন্ডকে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিকে, ফাঁসির রশিকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হবে, এমন কাজ তাঁরা করেননি। অন্যায়ের সামনে তাঁরা কখনো মাথানত করেননি।

যৌন উন্মাদ সেই নারীর কামনা-বাসনা পূরণ করতে হবে, নয় তো তাঁকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেতে হবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনে পথ খোলা ছিল দুটো। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যত্নের সাথে ধৈর্যকেই লালন করলেন। কারাগারকেই তিনি বেছে নিলেন। এই অবস্থায় নিপতিত হয়ে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর কাছে কি আবেদন করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ–وَاِلَّا تَصْرِفْ
عَنِّيْ كَيْدَ هُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ–فَاسْتَجَابَ لَه
رَبُّه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ–اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

ইউসুফ বললো, হে আমার রব ! এরা আমার কাছ থেকে যে কাজ পেতে চায় তার তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি অধিক পছন্দ করি। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো। তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং সেই স্ত্রীলোকদের কূট-কৌশলকে তাঁর কাছ হতে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চিতই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন। (সূরা ইউসুফ-৩৩-৩৪)

আল্লাহর কোরআন বলছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বিপদে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো।

তাঁর এই আবেদনের ধরণ থেকেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, এই সময় হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম যে অবস্থার মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিলেন, এই আয়াত কয়টি এই ঘটনার এক আশ্চর্যজনক চিত্র পেশ করেছে । উনিশ-বিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন যুবক, যাযাবর জীবনের অবদানে এক অপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ডিত দেহ আর ভরা যৌবনের অধিকারী তিনি। দারিদ্র্য, পরদেশ, আপন ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার ও যবরদস্তিমূলক দাসত্ব প্রভৃতি পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে আসার পর ভাগ্য তাকে তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাধিক সভ্যতা-সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্যের রাজধানীতে এক বড় ধনবান ও পদাধিকারী ব্যক্তির ঘরে এনে পৌঁছিয়ে দিল।

এখানে এই ঘরের স্ত্রীলোকটির সাথে তার দিন-রাতের দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার ছিল। প্রথমে-সেই নারীই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা গোটা রাজধানী শহরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর গোটা শহরের অভিজাত ও ধনবান পরিবারের নারীগণ তাঁকে দেখে আত্মহারা হয়ে যায়। এই সময় তাঁর চতুর্দিকে অসংখ্য ছলনাময়ী জালের আকর্ষণ সবসময় এবং সবস্থানেই তাকে জড়াতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তার মনে আবেগ-উচ্ছ্বাসের বন্যা-প্রবাহ জাগিয়ে তোলার জন্য, তার আল্লাহভীতি ভেঙ্গে চুরমার করে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য সীমাহীন ষড়যন্ত্র–চেষ্টা-সাধনা চলতে থাকে।

যেদিকেই তিনি যান, সেদিকেই দেখেন গুনাহ ও দুষ্কৃতিপূর্ণ চাকচিক্য ও জাঁকজমক সহকারে তাকে গ্রাস করার জন্য দুয়ার খুলে অপেক্ষায় দন্ডায়মান। যাদের ভেতরে ঈমান নেই, তারা পৃথিবীতে পাপের পথ নিজেরা সন্ধান করে আর পাপ স্বয়ং তার

যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঈমানদারের সন্ধানে ফিরতে থাকে। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জন্যও তাই ঘটেছিল। পাপ অপেক্ষা করে আছে, যে মুহূর্তেই তার মনে অন্যায় ও পাপের প্রতি একবিন্দু ঝোক-প্রবণতা দেখা যাবে, ঠিক তখনই সে নিজেকে সামনে পেশ করে দেবে। রাতদিন অহর্নিশি তিনি এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাটাচ্ছেন। কোনো এক মুহূর্তে তার ইচ্ছা-বাসনায় একবিন্দু শিথিলতা দেখা দিলেই অপেক্ষমান পাপের শত-সহস্র দরজার যে কোনো একটিতে প্রবেশ করতে পারেন।

এ ধরনের অবস্থায় একজন ঈমানদার আল্লাহ-বিশ্বাসী বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী যুবক যে সাফল্যের সাথে এ ধরনের শয়তানী আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন, তা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ধৈর্য কোন পর্যায়ে উপনীত হলে, সেই চরম মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করা যায়, তা ভাষায় ব্যক্ত করার বিষয় নয়–হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়। আর ঈমান না থাকলে এ ধরনের ধৈর্য্যও সৃষ্টি হয় না এবং বিষয়টি অনুভবও করা যায় না।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের আত্মসংযমের এই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির পরও আত্মচেতনা ও নৈতিক পবিত্রতার অতিরিক্ত অবদান এটাই ছিল যে, এতবড় একটি মারাত্মক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পরও তার হৃদয়ে কখনো কোনো অহংকার জাগেনি। এ জন্য তিনি কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করেননি বা নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেননি। কখনো এই গৌরব তার মনে জাগেনি যে, কত শত রূপসী–যুবতী নারী আমার জন্য পাগল-পারা, অথচ এরপরও আমার পদস্খলন ঘটেনি।

এই ধরনের অহংকার প্রকাশের পরিবর্তে তিনি বরং স্বীয় মানবীয় দুর্বলতার কথা চিন্তা করে কেঁপে কেঁপে উঠতেন আর বারবার বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর কাছে কাতর প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ্ ! আমি বড়ই দুর্বল মানুষ, এতসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের হাতছানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। হে আমার প্রতিপালক! তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও, তুমিই আমাকে বাঁচাও! কখনই যেন আমার পদস্খলন না ঘটে, এই ভয়ে কম্পমান আমি!'

আসলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের এটা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুকতম অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, ধৈর্য, সত্য পথে চলা, আত্মসংযম, মানসিক ভারসাম্য প্রভৃতি যেসব

অসাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল, এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত হয়ে তা প্রকাশ হয়ে পড়লো। এমন কঠোর ও কঠিন পরীক্ষার সময়ে সেসব গুণাবলী উৎকর্ষিত হয়ে উঠে-পূর্ণ শক্তিতে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ঈমান আনার পরে পরীক্ষা না এলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না, এই ঈমান তার ভেতরে কি কি গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঈমান আনার উপকারিতা কি, তা পরীক্ষায় নিমজ্জিত না হলে ঈমানদার অনুভব করতে পারে না। এ জন্য ঈমানদারের জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা অনিবার্য।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে মহান আল্লাহ ঐ সকল নারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কারাগারের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে যাবতীয় অপকৌশল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। এভাবে হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের কারারুদ্ধ হওয়া ছিল মূলত তাঁর এক বিরাট নৈতিক বিজয় এবং মিসরের রাজন্যবর্গ ও শাসক শ্রেণীর লোকদের চরম নৈতিক পরাজয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা। ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম কোনো অপরিচিতি ও অজ্ঞাত-কুলশীল লোক ছিলেন না। সমগ্র দেশে-অন্তত রাজধানীতে সর্বশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে জানতো ও চিনতো। বস্তুত যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি অধিকাংশ পদস্থ ও অভিজাত ঘরের নারীগণই ছিল পাগল প্রায়, যার রূপ-সৌন্দর্যের অগ্নিজ্বালায় নিজেদের ঘর-বাড়ি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে দেখে মিসরের শাসক শ্রেণী তাকে জেলে প্রেরণ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত মনে করলো, এমন ব্যক্তির দেশব্যাপী পরিচিতি যে কতটা ব্যাপক ছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে।

তার সম্পর্কে যে মিসরের প্রতিটি নগরে, জনপদে আলোচনা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। উপরন্তু এই লোকটি যে কত উন্নত, মজবুত ও নির্মল চরিত্রের মানুষ, সেটাও সবাই জেনে গিয়েছিল। তারা এটাও জানতে পেরেছিল যে, লোকটিকে তার নিজের কোনো অপরাধের কারণে কারারুদ্ধ করা হয় নি; বরং কারারুদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র এ জন্য যে, মিসরের রাজন্যবর্গ নিজেদের ঘরের নারীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার তুলনায় এই নির্দোষ ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করার সবচেয়ে সহজতম পথটি অবলম্বন করেছিল।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই অকারণে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে রাখা

বেঈমান ও স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যন্ত প্রাচীন ও চিরন্তন রীতি। এ ব্যাপারেও বর্তমানের স্বৈরাচারী–গণতন্ত্রের আলখেল্লাধারী শাসকগণ চার হাজার বৎসর পূর্বের স্বৈরশাসকদের তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু নয়। যদি কোন পার্থক্য সেকালের স্বৈরাচার আর এ কালের স্বৈরাচারের মধ্যে থেকেই থাকে, তা হলো শুধু এটুকু যে, সেকালের শাসকেরা 'গণতন্ত্রের' দোহাই দিত না আর একালের জালিম শাসকগণ তাদের যাবতীয় স্বৈরাচারী কর্মকান্ড বৈধ করার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের লেবাস ব্যবহার করে। সেকালের স্বৈরশাসকগণ আইনের কোন মাধ্যম ব্যতীতই বে-আইনী কর্মকান্ড পরিচালিত করতো, আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ তাদের প্রতিটি অবৈধ বাড়াবাড়ির 'বৈধতা' প্রমাণের জন্য পূর্বেই একটা আইন তৈরী করে নেয়। সেকালের স্বৈরশাসকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য সরাসরি লোকদের ওপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাতো আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ যার ওপর হামলা করে, তার সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এই লোকটির দ্বারা শুধু তাদের নয়, দেশ ও জাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক কথায়, সেকালের স্বৈরশাসকগণ শুধু জালিম ছিল আর বর্তমানের স্বৈরশাসকগণ জালিম তো বটেই সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদী ও নির্লজ্জও।

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে কারাগারে বন্দী করা হলো। তাঁর অপরাধ, তিনি ঐসব নারীদের যৌবনের কামনা-বাসনা পূরণ করেননি। তথাকথিত এই অপরাধে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য আল্লাহর নবীকে তারা বন্দী করেছিল। কারাগারের ভেতরেও তিনি নীরবে বসেছিলেন না। কারা কর্তৃপক্ষ ও সমস্ত কারাবন্দীদের কাছে তিনি আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের মতই দেখা দিলেন। তাঁর ভেতরে মহান আল্লাহ যে গুণাবলী নিহিত রেখেছিলেন, জান্নাতের যে সুবাস দিয়ে দিয়েছিলেন, তা গোটা কারাগারকে আমোদিত করে তুলেছিল।

সেখানের সমস্ত বন্দী এবং কারা কর্তৃপক্ষের কাছে এক সময় তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের রব বা প্রতিপালক হতে পারে না। প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। কারাগারের সমস্ত লোকজন তাঁর কাছে যে কোনো সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতো। জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই তারা পরামর্শের জন্য ধর্ণা দিত। তিনি কারা-জীবনে কিভাবে 'হক'-এর প্রচার ও প্রসার

ঘটিয়েছেন এবং তাঁর কারাগারের সাথীরা তাঁর কাছে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কিভাবে আসতো এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ-قَالَ اَحَدُ هُمَآ اِنِّىْ اَرٰنِىْ
اَعْصِرُ خَمْرًا-وَقَالَ الاخَرُ اِنِّىْ اَرٰنِىْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ
خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ-نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِه-اِنَّا نَرٰكَ
مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ-قَالَ لَايَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِه اِلاَّ
نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِه قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا-ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ
رَبِّىْ-اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ
بِالاخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ-وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِ ىْ اِبْرَاهِيْمَ
وَاِسْحٰاقَ وَيَعْقُوْبَ-مَاكَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ
شَىْءٍ-ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ-يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ
مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ ا لْوَاحِدُ الْقَهَّارُ-مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِه اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَابَاؤُكُمْ مَّا
اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ-اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰه-اَمَرَ اَلاَّ
تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ-ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَا لنَّاسِ
لاَيَعْلَمُوْنَ-يٰصَاحِبَىِ لسِّجْنِ اَمَّا اَحَدُ كُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّه
خَمْرًا-وَاَمَّاالاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ
رَّاْسِه-قُضِىَ الاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ-وَقَالَ لِلَّذِىْ
ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسَاهُ
الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّه فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ -

কারাগারে তাঁর সাথে আরো দু'জন দাস প্রবেশ করেছিল। একদিন তাদের একজন তাকে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মদ প্রস্তুত করছি। অপরজন বললো,

আমি দেখেছি যে, আমার মাথার ওপর রুটি রাখা আছে আর পাখি তা খাচ্ছে। উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।

ইউসুফ বললো, এখানে তোমরা যে খাবার লাভ করো, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দেবো। আমার রব আমাকে যে জ্ঞান-ভান্ডার দান করেছেন, এটা সেই জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনা ও পরকালকে অস্বীকার করে, আমি তাদের নিয়ম নীতি পরিত্যাগ করেছি। আর আমার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানবতার প্রতি এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যতীত আর অন্য কারো দাস বানাননি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাঁর শোকর আদায় করে না। হে কারাগারের বন্ধুরা আমার! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না সেই এক আল্লাহ–যিনি সব কিছুর ওপরে বিজয়ী–মহাপরাক্রমশালী।

তাঁকে ত্যাগ করে তোমরা যাদের দাসত্ব করো, তারা কয়েকটি নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো। আল্লাহ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য নয়। তাঁর আদেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা আর কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাঁটি জীবন-যাপন পন্থা, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

হে কারাগারের বন্ধুরা আমার! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন নিজের প্রভু (মিসর অধিপতি)-কে শরাব পান করাবে। আর আরেকজনকে শূলে চড়ানো হবে। আর পাখি তার মাথার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলে, তার ফয়সালা হয়ে গেল। (সূরা ইউসুফ-৩৬-৪২)

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে যখন বন্দী করা হয়, তখন তার বয়স সম্ভবত কুড়ি-একুশ বৎসরের বেশি ছিল না। ইতিহাস বলে, জেল থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি যখন মিসরের শাসক হলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। আর কোরআন বলে যে, জেলখানায় তিনি 'বিদআ' ছিনিন' অর্থাৎ কয়েক বছর পর্যন্ত ছিলেন। আরবী ভাষায় 'বিদআ' শব্দটি দশ সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

যে দুইজন গোলাম জেলখানায় হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের সঙ্গে প্রবেশ করেছিল, ইতিহাসে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের একজন ছিল মিসর অধিপতির শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান আর অপরজন ছিল রুটি প্রস্তুতকারীদের প্রধান। এই দুই ব্যক্তিকে মিসর অধিপতি এই অপরাধে জেলে প্রেরণ করেছিল যে, একবার এক খাওয়ার মজলিসে পরিবেশিত রুটিগুলো তিক্ত লেগেছিল আর শরাবের একটা পাত্রে মাছি পাওয়া গিয়েছিল।

আল্লাহর কোরআনের বর্ণনা হলো, 'উভয়েই বললো, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি বলুন, আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি।'

জেলখানায় হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে কি দৃষ্টিতে দেখা হত, এই কথা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উপরে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্মুখে রেখে বিবেচনা করলে এ সম্পর্কে আশ্চর্য বোধ হয় না যে, এরা হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের কাছেই কেনো স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইতে এসেছিল এবং 'আমরা দেখছি আপনি একজন সৎ লোক' বলে তাঁর খেদমতেই বা কেন এত ভক্তি-শ্রদ্ধা পেশ করলো।

কারণ কারাগারের ভেতরের ও বাইরের সব লোকেরই জানা ছিল যে, এই ব্যক্তি কোন অপরাধ করে জেলে আসেন নি; বরং তিনি একজন সদাচারী ও পবিত্র চরিত্রের লোক। অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ও তিনি নিজের পবিত্রতা ও আল্লাহভীরুতার প্রমাণ দিয়েছেন। একালে সমগ্র দেশে তাঁর অপেক্ষা পবিত্রতর ব্যক্তি একজনও নেই। এমনকি দেশের ধর্ম-নেতাদের মধ্যেও তাঁর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণে কেবল কয়েদীরাই যে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো তাই নয়, বরং জেলখানার অফিসার ও কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এই লোক দু'জনের ভেতরে একজনের অর্থাৎ খাদ্য বিভাগের প্রধানের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল এবং মদ পরিবেশনকারী তার পূর্ব পদে বহাল হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক 'হক'-এর দাওয়াত

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার পূর্বে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম যে ভাষণ দান করলেন, ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মূল প্রাণবস্তুই হলো তাঁর সেই ভাষণ। আর স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত তওহীদ সংক্রান্ত ভাষণগুলোর মধ্যেও এটা

অতি উত্তম সম্পদ। কোরআন আমাদেরকে জানায় যে, হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের ছিল নবী-জনোচিত এক 'মিশন' এবং এর দাওয়াত ও প্রচার কার্য তিনি জেলখানা থেকেই শুরু করেছিলেন।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই ঘটনাটিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ময়দানে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে আগ্রহী, তাদেরকে অবশ্যই এই ঘটনাটি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় এবং এ থেকে আন্দোলনের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র কাহিনী শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘটনা কোরআনে বর্ণনা করেননি। এর একাধিক দিক এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণা করলে এমন কতকগুলো দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, যা অবগত হওয়া আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সেদিকগুলো হচ্ছে–

এই প্রথমবার আমরা হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে দেখতে পাই। এর পূর্বে তাঁর জীবন কাহিনীর আর যেসব দিক কোরআন মজীদ উজ্জ্বল রূপে আমাদের সম্মুখে পেশ করেছে, তাতে আমরা শুধু তাঁর উন্নত চরিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তাতে 'হক'-এর প্রচার ও দাওয়াত দেয়ার কোনো চিহ্নই আমরা দেখতে পাই না। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়গুলো নিছক প্রস্তুতি ও আত্মগঠনের মধ্যে সীমিত ছিল। নবুয়াতের দায়িত্ব এই কয়েদখানার পর্যায়েই তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়। আর নবী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

নিজের মূল পরিচয়ও তিনি এই প্রথমবার লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন। এর পূর্বে আমরা দেখতে পাই, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে সম্মুখে আসা যে কোনো অবস্থাকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে কবুল করেছেন। কাফেলার লোকেরা যখন তাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিসরে আনিত হলেন, যখন তাঁকে আযীযে-মিসর-এর কাছে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হলো-এর কোনো একটি পর্যায়েও তিনি নিজেকে ইবরাহীমের প্রপৌত্র ও ইসহাক আলায়হিস্ সালামের পৌত্র ও হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের পুত্র ছিলেন বলে কোনো পরিচয়ই দেননি। তাঁর বাপ-দাদা কোনো অপরিচিত লোক ছিলেন না। কাফেলার লোক মাদিয়ানবাসীই হোক কি ইসমাঈলী, তারা উভয় পরিবারের সাথেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মিসরের লোকেরাও

অন্তত হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল না, বরং হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম যে ভংগীতে তাঁর ও হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালামের উল্লেখ করছেন, তাতে অনুমান করা যায় যে, এই তিন মহান ব্যক্তির খ্যাতি মিসর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম বিগত চার পাঁচ বছর যাবৎ যেসব দুরাবস্থায় পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন কখনো নিজের বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সেসব হতে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করেন নি।

সম্ভবত তিনি নিজেও অনুভব করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য এই ধরনের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে থেকে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে নিছক 'হক'-এর প্রচার ও প্রসারের খাতিরে তিনি এই মহাসত্য উদঘাটন করলেন যে, তিনি কোনো নতুন ও অপরিচিত দ্বীন পেশ করছেন না; বরং হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের পরিচালিত তওহীদের দাওয়াত ও প্রচার কার্যের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সাথেই তাঁর সম্পর্ক। এ ধরনের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছিল যে, অতীতের সব কালে ও সব যুগেই সত্যপন্থী লোকেরা যেদিকে আহ্বান জানিয়ে এসেছেন তিনি সেই শাশ্বত চিরন্তন মহাসত্যের দিকেই লোকদের আহ্বান জানাচ্ছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই তিনি নবী নির্বাচিত হয়েছেন।

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম যেভাবে তাঁর দাওয়াত পেশ করার সুযোগ বের করেছিলেন তাতে 'হক'-এর দাওয়াত প্রচারের এক চমৎকার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থা এই ছিল যে, দুইজন লোক তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা বলে নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রমাণ দিয়ে তাঁর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চায়। জওয়াবে তিনি বলেন, 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো আমি তোমাদের বলবোই, কিন্তু আমি যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলবো তা কোন্ উৎস হতে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তা পূর্বেই জেনে নাও।'

এভাবেই তিনি তাদের কথার ভেতর থেকেই কথা বলার সুযোগ বের করে তাদের সম্মুখে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন শুরু করলেন। 'হক' প্রচারের এই ধরণ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, কারো মনে যদি সত্যই 'হক' প্রচারের আগ্রহ বর্তমান থাকে এবং এর কৌশলও তার জানা থাকে, তাহলে সে অতি সহজেই কথার ধারাবাহিকতাকে খুব সুন্দরভাবে নিজের কথার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর যার মনে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কোন চিন্তা বা আগ্রহই নেই, তাদের সম্মুখে

সুযোগের পর সুযোগ এসে চলে যায়; বিরাট বিরাট মাহফিলে তারা বক্তা হিসেবে গমন করে, কিন্তু সেটাকে নিজের কথা বলার সুযোগ হিসেবে কখনো গ্রহণ করে না। এমন ধরনের ওয়াজ তারা করে যে, নিজেরা কি বলছে তাও তারা জানে না এবং অগণিত শ্রোতাদেরকে কোনদিকে নিয়ে যেতে চায়, সে লক্ষ্যও তাদের থাকে না।

পক্ষান্তরে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে যে প্রচার করতে আগ্রহী হয়, সে তো সুযোগের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে থাকে আর সে সুযোগ এলেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুযোগ সন্ধান আর নির্বোধ লোকের অমার্জিত প্রচার-সময় জ্ঞান এবং উপযুক্ত পরিবেশের জ্ঞান যাদের নেই, মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরে, রাস্তা-পথে যে কোন পরিবেশে, কার মন-মানসিকতা কেমন আছে তার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে দাওয়াত দেয়া শুরু করে–এই দুইয়ের মাঝে শত যোজন পার্থক্য রয়েছে। এই শেষোক্ত লোকেরা সময় ও সুযোগের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেয়ার চেষ্টা করে এবং এভাবে ইসলাম প্রচারের নামে লোকদের মধ্যে অযথা মতপার্থক্য সৃষ্টি ও বাকবিতন্ডা সৃষ্টি করে উল্টো ইসলামের প্রতিই তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দেয়।

এ ঘটনা থেকে লোকদের কাছে দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারের সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ প্রথমেই দ্বীনের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি পেশ করতে শুরু করেননি; বরং লোকদের সামনে তিনি দ্বীনের সেই মূল সূচনা বিন্দুর কথাই পেশ করেন যেখান থেকে সত্য দ্বীনের পথ বাতিল পন্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। এই সূচনা বিন্দুটি হলো তওহীদ ও শিরকের মধ্যকার পার্থক্য। এমনকি এই পার্থক্যকেও তিনি এমন যুক্তিসংগত পন্থায় স্পষ্ট করে তোলেন যে, সাধারণ বুদ্ধির কোনো লোকই তা অনুভব না করে থাকতে পারবে না। বিশেষ করে এই সময় যাদের লক্ষ্য করে তিনি কথা বলছিলেন, তাদের মন-মগজে তো এই কথাটি তীরের মত বসে গিয়েছিল। কেননা তারা ছিল চাকরিজীবি গোলাম আর তারা এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করছিল যে, একজন মনিবের গোলাম হওয়া অনেক মনিবের গোলাম হওয়া অপেক্ষা ভালো। অনুরূপভাবে তারা আরো উপলব্ধি করেছিল যে, বান্দাদের বন্দেগী করা অপেক্ষা সারা জাহানের মালিক ও মনিবের গোলামী করাই অধিক কল্যাণকর।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এখানে শ্রোতাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে ও তাঁর ধর্ম অবলম্বন করতেও বলেন নি। তাঁর দাওয়াত দেয়ার ভঙ্গি ছিল

বড়ই বিস্ময়কর ধরনের। তিনি লোকদেরকে বললেন, 'চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ আমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। তিনি কেবল নিজের ছাড়া আমাদেরকে আর কারোই বান্দাহ্ বানান নি, কিন্তু লোকেরা তাঁর শোকর করে না, বরং শুধু শুধুই তারা মনগড়াভাবে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নেয় ও সেগুলোরই দাসত্ব করে।'

এমন কি তিনি শ্রোতাদের ধর্মমতেরও সমালোচনা করেন, কিন্তু তা করেন খুবই বুদ্ধিমত্তা সহকারে। তাতে কারো মনে একবিন্দু কষ্ট দেয়ার নীতি তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে, এই যে সব মাবুদকে তোমরা অন্নদাতা, নে'মাতদাতা, দুনিয়ার মালিক, ধন-সম্পদের প্রভু, বা রোগ-স্বাস্থ্যের নিয়ামক ইত্যাদি বলে অভিহিত করো, এ সবই অন্তঃসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নামগুলোর পেছনে কোন প্রকৃত অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী মালিক ও প্রতিপালক বলে কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। আসলে সবকিছুরই মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যাকে তোমরাও বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী বলে মানো। তিনি অপর কারো জন্য প্রভু, উপাস্য বা মাবুদ হওয়ার কোন সনদই নাযিল করেন নি। জগত পরিচালনার সমস্ত অধিকার ও ইখতিয়ার তিনি নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশই এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারোই বন্দেগী করবে না।

এভাবে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের জীবনের মূল্যবান প্রায় দশটা বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনগুলো পার হয়ে গেছে। কারাগারে তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেননি। ইসলামী আদর্শ কারা-কর্তৃপক্ষ এবং বন্দীদের মাঝে প্রচার করেছেন। তাদেরকে আল্লাহর গোলামী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর যমীনে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাঁরা যে কোনো অবস্থাতেই থাকুন না কেনো, মুহূর্ত কালের জন্যও তাঁরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিল হন না।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর রহমতের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন, তিনি ধৈর্যহারা হননি। সমস্ত পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন তারপরে কারাগার থেকে তাকে সম্মানের সাথে বের করে এনেই মহান আল্লাহ তাঁকে দেশের শাসকের পদে আসীন করেছিলেন।

ফুল যেখানেই ফোটে তার আপন সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ সে ফুলের সৌরভ অনুভব করে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে মহান আল্লাহ সে যুগের

সুগন্ধ যুক্ত ফুল হিসেবেই শুধু প্রেরণ করেননি, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সেই ইউসুফ নামক ফুল থেকে সুগন্ধি গ্রহণ করবে। সে ফুল যুগ যুগান্তরে সৌরভ ছড়াবে। সে ফুল আজ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তাঁর অমোছনীয় সেই সুবাস রয়ে গেছে এবং থাকবে।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

শুধু ইউসুফ আলাইহিস্ সালামই নন, তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, তিনিও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি, সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে হারিয়েও তিনি এতটুকু ধৈর্যহারা হননি। মানুষের কাছে তিনি তাঁর হৃদয়ের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করেননি। আল্লাহর কাছেই তিনি আবেদন পেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর অন্যান্য ছেলেদের কি বলেছিলেন, কোরআন আমাদেরকে শোনাচ্ছে– فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ আমি সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করবো (সূরা ইউসুফ-১৮)

তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদেরকে বলেছিলেন, আমি আমার মনের যন্ত্রণার কথা এক মাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছেই করছি না এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হচ্ছি না। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধু তারাই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সে কথা কোরআনের সূরা ইউসুফের মাধ্যমে আমাদেরকে শুনাচ্ছেন–

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ–يٰبَنِيَّ اذْ هَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلاَتَا يْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ–اِنَّه لاَيَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ–

আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার আবেদন আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছেই করছি না। আর আল্লাহর কাছ থেকে আমার যা জানা আছে তা তোমাদের নেই। হে আমার ছেলেরা ! তোমরা গিয়ে ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সন্ধান করো। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধু কাফেররাই।

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম বয়সের একটা প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত

হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের অন্যান্য ভাইগণ খাদ্যের সন্ধানে মিসরে যেতে বাধ্য হলেন, এক পর্যায়ে যখন তাঁর সাথে ভাইদের পরিচয় হলো, তখন তিনি মিসরের শাসক। ভাইদেরকে তিনি কোন শাস্তি দেননি এমনকি কোনো কটু কথাও বলেননি। তাদের কাছ থেকে তিনি যখন শুনলেন, পিতার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছে। তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম পিতার জন্য নিজের শরীর মোবারকের জামা তাঁর ভাইদেরকে দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এই জামা আব্বার চেহারার ওপর রাখলেই আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর হারানো দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। তখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর পবিত্র জামা নিয়ে মিসর থেকে বাড়ির পথে অর্থাৎ কেনআনে যাত্রা করেছিল।

মিসর এবং কেনআন, এই দুইটি দেশের মাঝে বেশ ব্যবধান। তবুও মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতী ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের শরীরের গন্ধ হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের নাসারন্ধ্রে পৌছে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই অনুভূতির কথা প্রকাশ করতেই তাঁর পরিবারের লোকজন তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল, এটা আপনার মনের কল্পনা। যেদিন থেকে ইউসুফ হারিয়ে গেছে, সেদিন থেকে আপনি তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করছেন। সেই চিন্তা আপনাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, আপনি এখন পর্যন্ত আশায় আছেন, ইউসুফ একদিন ফিরে আসবেই। এটা আপনার সেই পুরনো কল্পনা। এ সম্পর্কে কোরআন বলছে–

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ–قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ–فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا–قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ–اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ–قَالُوْا يٰاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ–قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ–اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

এই কাফেলা যখন (মিসর থেকে) যাত্রা করলো, তখন তাদের পিতা (কেনানে বসে) বললো, আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি। তোমরা যেন বলে না বসো যে আমি বয়সের কারণে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহর

কসম ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন। তারপর যখন সুসংবাদ বহনকারী এসে পৌছলো, তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের ওপর রাখলো আর সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, আমি না তোমাদেরকে বলছিলাম, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। সবাই বলে উঠলো, আব্বাজান ! আপনি আমাদের গুনাহ্ মাফের জন্য দোয়া করুন। আমরা সত্যই অপরাধী। সে বললো, আমি আমার রব-এর কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা ইউসুফ-৯৪-৯৮)

আমি ইউসুফের সুবাস অনুভব করছি–হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের এই কথা থেকে নবী-রাসূলদের অসাধারণ শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কাফেলা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের জামা নিয়ে সবেমাত্র মিসর থেকে রওয়ানা করলো আর এই দিকে শত শত মাইল দূরত্বে থেকে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম আপন সন্তান হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের শরীরের 'সুবাস' পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও জানতে পারা যায় যে, নবী-রাসূলদের এই শক্তি তাঁদের নিজস্ব ও স্ব-উপার্জিত নয়; এটা একান্তভাবে আল্লাহ্র দান। আল্লাহ্ই দান করেছেন বলে তারা এই শক্তির অধিকারী হয়েছেন। আর আল্লাহ্ যখন যে পরিমাণ চান, তাদেরকে সেই শক্তি কাজে লাগানোর সুযোগ দেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম অনেক বছর ধরে মিসরে রয়েছেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম তাঁর কোনো গন্ধ অনুভব করলেন না। কিন্তু সহসাই অনুভূতি-শক্তি এত বেশী তীব্র হয়ে উঠলো যে, তাঁর জামা নিয়ে মিসর থেকে রওয়ানা হতেই তিনি বাড়িতে বসেই হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের সুবাস লাভ করতে শুরু করলেন।

ঘরের লোকজন বললো, আল্লাহ্র কসম ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো ভুলেই নিমজ্জিত আছেন–এই কথাগুলো হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের পরিবারের লোকজনের। তাদের কথার ধরণ দেখে মনে হয় যে, গোটা পরিবারে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ছাড়া আর কেউ পিতার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতো না এবং হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম নিজেও তাঁর পরিবারের লোকদের মানসিক ও নৈতিকহীনতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন।

পক্ষান্তরে যে ঘরের প্রদীপের আলো বাইরের জগতকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলছিল; কিন্তু স্বয়ং সে ঘরের লোকেরা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর তাদের দৃষ্টিতে সে 'প্রদীপ' এক টুকরা কয়লার অধিক কিছু নয়। প্রকৃতির এই নির্মম পরিহাসের সাথে ইতিহাসের প্রায় সকল বড় বড় ব্যক্তিত্বেরই সাক্ষাত ঘটেছে। এই পৃথিবীতে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য যারা আগমন করেছেন, নবী-রাসূলদের অবর্তমানে যারা ইসলামী মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য অক্লান্ত শ্রম দান করছেন, আগামীতেও করবেন, ইসলামকে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা নিজের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তাদের অধিকাংশের পরিবারের লোকজনের অবস্থা হলো, তারা সত্য পথ অবলম্বন করতে আগ্রহী হয় না। অথচ তাদের ঘরের ভেতরেই মহাসত্যের মশাল আলো বিকিরণ করতে থাকে। যেমন হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের কয়েকজন সন্তান, তাদের পিতা এবং ভাই হলেন আল্লাহর নবী। কিন্তু তারা সেই পিতার কাছ থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেদেরকে পূর্ণ মুসলিমে পরিণত করতে পারেনি।

এখানে এ কথাও চরম সত্য যে, অধিকাংশ নবীগণ যখন দায়িত্ব পালনের নির্দেশ লাভ করেছেন, তখন তারা অবিবাহিত বা সন্তান-সন্ততিহীন ছিলেন না। তাদের সন্তান-সন্ততিও নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে পরিবার গঠনের শুরু থেকেই তাদেরকে আল্লাহর আইন পালনে অভ্যস্থ করার কোন সুযোগ ছিল না। তবুও নবীগণ তাদের সন্তানদের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যেন তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

বর্তমানে পরহেজগার হিসেবে পরিচিত এমন কিছু লোকজন দেখা যায়, যাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী। তাদের সন্তান কেনো এমন হলো, এ প্রশ্ন তাদের কাছে করলে তারা নবীদের সন্তানদের উদাহরণ পেশ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু পারিবারিক জীবন গঠন করার পূর্বেই যিনি দ্বীনি আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়েছেন, তিনি তো তার পরিবারে ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করে এমন ধরনের ব্যবস্থা প্রথম থেকেই গ্রহণ করবেন। যেন সেই পরিবারে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারে। দ্বীনি আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ লোকজন এ দায়িত্ব পালন করেন না। ফলে তাদের সন্তান-সন্ততি দ্বীনি আন্দোলন থেকে বিরত থাকে। সন্তানকে তারা শিশু বয়সে সাথে নিয়ে

আন্দোলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অভ্যস্থ করে তুলেন না। এমনকি অনেকে মসজিদেও সাথে করে নিয়ে যান না। শিশু বয়স থেকে শিশুকে যে কাজে অভ্যস্থ করে তোলা হয়নি, ইসলাম বিরোধী এই পরিবেশে তারা বড় হয়ে দ্বীনি আন্দোলন পসন্দ করবে কিভাবে? এ কথা ভালোভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এসব সন্তানদের পিতাগণ নবীদের সন্তানদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের 'সবর'

ঈমানদার ব্যক্তির গোটা জীবনই হলো ধৈর্যের জীবন। আল্লাহর ওপরে সে থাকে আশাবাদী। কারণ সে জানে, তার ওপরে যতবড় বিপদই আসুক না কেন আশ্রয় লাভ করার একটি স্থান তার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে উন্মুক্ত রয়েছে, তাঁর আশ্রয় দাতা হলেন আল্লাহ। আমরা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের জীবনে দেখতে পাই, যখন তাঁকে বিশাল আকৃতির একটি মাছ উদরস্থ করে পানির অতল তলদেশে চলে গেল–এমন বিপদ তার ওপরে নেমে এলো যে, এমন ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদে কোন মানুষ কখনও নিমজ্জিত হয়নি। কোন মানুষ এই ধরনের বিপদের কথা কল্পনাও করেনি। তার ওপরে যখন এমন বিপদ দেখা দিল, তখন তিনি অধৈর্য হননি। ভয়ে আতঙ্কে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় নি। তিনি সাহস হারাননি। আল্লাহর ওপরে ছিল তার অবিচল আস্থা।

ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে তিনি বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একদিকে রাতের ঘন অন্ধকার। অপরদিকে পানির নিচের অন্ধকার। আরেকদিকে মাছের পেটের অন্ধকার। এই ত্রিবিধ অন্ধকারে বিপদে নিমজ্জিত হয়ে তিনি মাছের পেটের ভেতরে বসে স্থির বিশ্বাসে আর্তচিৎকার করে উঠেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকেই শুধু বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন, বিষয়টি এমন নয়, বরং আয়াতে বলা হয়েছে, আমার মুমিন বান্দাদের মধ্যে যারা ভুল করবে এবং সেই ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা ও সাহায্য চাইবে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে সাহায্য করবো। মহান আল্লাহ বলেন–

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ-اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ

الظّٰلِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ-وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ-وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ-

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো, 'তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।' তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া-৮৭-৮৮)

এমন একস্থান থেকে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, যেখান থেকে আবেদন করলে সে আবেদন কেউ শুনতে পাবে না এবং সে আবেদন শোনার মত শক্তি ও ক্ষমতাও কারো নেই। তার সে করুণ আর্তনাদ পানির ভেতরে কেউ শুনতে পেলো না, পৃথিবীর কেউ শুনতে পেলো না। আকাশের কেউ শুনলো না। কিন্তু সর্বশ্রোতা মহান আল্লাহ সে আবেদন শুনেছিলেন। তিনি মাছের পেটের ভেতরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে দিলেন যে, মাছ বাধ্য হলো তাকে উদগীরণ করে দিতে।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার ইউনুসের ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে বিপদ মুক্ত করলাম। এমনিভাবে আমার কোনো মুমিন বান্দাহ্ যখন কোন অপরাধ করে বসে এবং এ কারণে সে পৃথিবীতে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর সে নিজের ভুল অনুভব করতে পেরে আমার কাছে যখন সাহায্য কামনা করে, তখন আমি তাকে সাহায্য করি। এটাই আমার নীতি, আমি আমার বিপদগ্রস্ত বান্দার আহ্বান শুনে নীরব থাকি না। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا-

জেনে রাখো, দুঃখ আর কষ্টের পরে রয়েছে সুযোগ সুবিধা আর অস্বচ্ছলতার সাথেই রয়েছে উ..র সবচ্ছলতা। (সূরা আলাম নাশরাহ্)

যত বড় বিপদই আসুক না কেন, এই বিপদের পরেই মহান আল্লাহ তাঁর গোলামদের ওপরে রহমত নাযিল করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, অন্ধকার যত গভীর হয়, পূর্বাশার প্রান্তে সূর্যের উদয় লগ্ন ততই এগিয়ে আসে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর গোলামদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ-

তোমরা মনভাঙা হয়োনা, চিন্তাগ্রস্থ হয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।

হতাশা মানুষের চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আসে, বিবেক বুদ্ধি প্রকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেন–

না-হো-না-উমিদ, না উমিদি জাওয়ালে ইল্ম ও ইরফান হ্যায়
উমিদে মর্দে মুমিন হ্যায় খোদাকে রাজদাঁনু মে।

হতাশাবাদীদের অন্তর্গত হয়ো না, হতাশা-নৈরাশ্য মানুষের জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিকে ধ্বংস করে। মুমিনদের আশা খোদার রহস্যবিদ বান্দাগণের অন্তর্গত।

শয়তানের প্ররোচনা ও 'সবর'

শয়তান স্বয়ং অস্থির চিত্তের ও অহঙ্কারী। এ জন্য যারা ধৈর্য অবলম্বন করে, শয়তান নানাভাবে তাদের ভেতরে অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে তাদেরকে মহান আল্লাহর রহমতের ছায়া থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবীর উপস্থিতিতে একবার একজন লোক সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করতে থাকে। তিনি নীরবে প্রতিপক্ষের কটুবাক্য শুনতে থাকেন আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকরের নীরবতা দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

প্রতিপক্ষ কটুবাক্য প্রয়োগ করেই চলেছে। এক সময় হযরত আবু বকরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো এবং তিনি প্রতিপক্ষকে কঠোর ভাষায় জবাব দিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের গালিগালাজের জবাব দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো এবং বিরক্তির ভাব ছেয়ে গেলো। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর আল্লাহর রাসূলের এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। পথিমধ্যে তিনি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি যখন আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করছিলো, তখন আপনি নীরবে হাসছিলেন, কিন্তু যখনই আমি তার গালির জবাব দিলাম, আপনি অসন্তুষ্ট হলেন, এর কারণ কি?

আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি যতক্ষণ নীরব থেকে প্রতিপক্ষের কটুবাক্য সহ্য করছিলে, ততক্ষণ তোমার সাথে থেকে একজন ফেরেশ্‌তা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু তুমি যখনই লোকটির গালির জবাব দিলে তখনই সেই ফেরেশ্‌তার স্থানে শয়তান এলো। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

শয়তান নানাভাবে প্ররোচিত করে ধৈর্যশীলদেরকে ধৈর্যহীনতার পথে ঠেলে দিতে চায়। এ জন্য মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সূরা হামীম সিজ্‌দায় বলেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা অনুভব করতে পারো তাহ্লে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।

(শয়তান কিভাবে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের দ্বারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এ বিষয়ে আমরা তাফসীরে সাঈদী-আমপারা-সূরা নাস-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের সাথে সূরা নাস-এর তাফসীর একত্রে পাঠ করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা সহজ হবে।)

মুমিনের জীবন ও 'সবর'

ঈমান আনার পরে একজন মানুষকে তার মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেক পদে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'ঐ তিন সময় ধৈর্য অবলম্বন করার সর্বোত্তম সময়–বিপদ-মুসিবতে নিপতিত হলে ধৈর্য ধারণ করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং এই বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, যেমন নামাযের ক্ষেত্রে। নামাযে যখন কোনো মানুষ দন্ডায়মান হয়, তখন তো সে মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যেমন ধৈর্যহীনতার পরিচয় তেমনি মহান আল্লাহর শানে বেয়াদবির শামিল।

রাষ্ট্রপ্রধান, কোনো মন্ত্রী বা রাষ্ট্রীয় পদে আসীন ক্ষমতাবান কোনো লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। কখনো দেখা পাওয়া যায় কখনো পাওয়া যায় না। নানাজনের কাছে ধর্ণা দিয়ে যদিও কারো ভাগ্যে দেখা করার সুযোগ ঘটে, তবুও সংক্ষিপ্ত সময়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হয়। যাদের ভাগ্যে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটে তারা কেউ তাড়াহুড়া করে না। বরং কতটা বেশী সময় তার সামনে থেকে নিজের অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করতে পারবে, মানুষ সেই সুযোগ খুঁজতে থাকে। যিনি সাক্ষাৎ করছেন এবং যার সাথে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে, তারা উভয়ে মানুষ এবং মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

কিন্তু নামাযের মাধ্যমে যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে, তিনি অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের যে কোনো প্রয়োজন মুহূর্তকালের মধ্যে পূরণ করতে সক্ষম। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কারো কাছে ধর্ণা দিতে হয় না, লাইন ধরতে হয় না এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সাক্ষাতের জন্য সময় ভিক্ষা চাইতে হয় না। গোপনে-প্রকাশ্যে, আলোয়-অন্ধকারে এবং যমীনে ও আকাশে যেখানে খুশী, সেখানেই তাঁকে সিজ্‌দা দিয়ে যে কোনো প্রয়োজনের কথা তাঁর দরবারে পেশ করা যায়। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'বান্দা ঐ সময়ে মহান আল্লাহর সবথেকে কাছাকাছি হয়ে যায়, যখন সে আল্লাহকে সিজ্‌দা করে।' নামায এমনই এক ইবাদাত যে, কোনো মাধ্যম ব্যতীতই বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়। বান্দা যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন তার মনে এই চেতনা জাগ্রত থাকতে হবে যে, সে আল্লাহকে দেখছে না, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে দেখছেন।

সে আল্লাহর কথা শুনছে না কিন্তু সে যা বলছে, তা তিনি শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন। সে শূন্য কোনো স্থানে সিজ্‌দা দিচ্ছে না, বরং সে আল্লাহ্ তা'য়ালার পায়ের ওপরে মাথা রেখে তাঁকে সিজ্‌দা দিচ্ছে। তার প্রত্যেকটি স্পন্দন আল্লাহ্ তা'য়ালা লক্ষ্য করছেন-এই চেতনা তার ভেতরে জাগ্রত রাখতে হবে। সম্মান-মর্যাদা, হায়াত, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা তথা সমস্ত কিছু চাওয়া-পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায। এই নামাযে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর মানুষ এই নামাযেই সর্বাধিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করে। যথাযথভাবে চার রাকাআত ফরজ নামায আদায় করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তার চার ভাগের এক ভাগ সময়ে চার রাকাআত নামায শেষ করে।

নামায আদায় করতে হবে পরম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভয়ের সাথে। যখন যে ওয়াক্তের নামায আদায় করা হচ্ছে, সে সময় মনে এই চেতনা জাগ্রত থাকবে যে, এরপরের ওয়াক্ত নামায আদায় তথা আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা করার সুযোগ নছিবে আর না-ও জুটতে পারে। মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। সুতরাং এই নামাযই তার জীবনের শেষ নামায। এই চেতনা যদি মনে জাগ্রত থাকে, তাহলে তো স্বাভাবিকভাবেই সে ব্যক্তি পরম যত্নের সাথে গভীর শ্রদ্ধায় আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা করবে। কিন্তু অধিকাংশ নামাযীর মধ্যে এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদ থেকে কখন ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে, এই চিন্তায় তারা অস্থির থাকে।

শুধু নামাযই নয়, মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে পরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। রোযা পালনের ক্ষেত্রে অনাহারে সারা দিন অতিবাহিত করা–এ ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। রোযা রেখে অস্থিরতা প্রকাশ করা, কথায় কথায় ক্রোধান্বিত হওয়া, চেহারায় মলিনতা ফুটিয়ে তোলা অসহিষ্ণুতার নামান্তর। যে উদ্দেশ্যে রোযা ফরজ করা হয়েছে, এসব কাজ সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত। মানুষের দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের মধ্যে হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের গুরুত্ব যেমন, রোযা পালনের ক্ষেত্রে পানাহার ত্যাগ করার গুরুত্বও অনুরূপ। শুধুমাত্র পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নামই রোযা নয়। রোযা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ইবাদাতের দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক দিক অন্যটি হলো অভ্যন্তরীণ দিক। যেমন নামায, মানুষ আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেও নামায আদায় করতে পারে আবার প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যেও নামায আদায় করতে পারে।

জিহাদের ময়দানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেও জিহাদ করতে পারে আবার লোক সমাজে প্রশংসা অর্জন, নিজের বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যেও জিহাদ করতে পারে। কিন্তু রোযা এমন একটি ইবাদাত, যা প্রদর্শন করার কোনো উপায় নেই। এই জন্য হাদীসে বলা হয়েছে, রোযার পুরস্কার মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং প্রদান করবেন। যে আল্লাহর ভয়ে চৈত্র-বৈশাখ মাসের খর-তাপের মধ্যে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ার পরও সামনে উপস্থিত ঠান্ডা পানির পেয়ালার দিকে আল্লাহর ভয়ে রোযাদার হাত বাড়ায় না। যে আল্লাহর ভয়ে রোযাদার ধৈর্যের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানি পানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সেই আল্লাহর ভয়েই রোযাদার ব্যক্তি মিথ্যা বলা থেকে, গীবত, চোগলখুরী, পরচর্চা-পরনিন্দা, অপরের দোষ অনুসন্ধান, লজ্জাহীনতা, সুদ-ঘুষ তথা যাবতীয় অবৈধ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত

রাখবে এবং এসব কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তা অবলম্বন করবে। রোযা পালনের জন্য পেটকে যেমন খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে, অনুরূপভাবে দেহের মন-মস্তিষ্কের দ্বারাও রোযা পালন করতে হবে। চোখ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কিছু না দেখার অর্থ হলো চোখের রোযা। মহান আল্লাহর অপসন্দীয় স্থানে গমন করা থকে পা-দুটোকে বিরত রাখা হলো পায়ের রোযা। আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কর্ম থেকে হাত দুটোকে বিরত রাখা হলো হাতের রোযা। মন-মস্তিষ্ক দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশের বিপরীত কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা হলো মন-মস্তিষ্কের রোযা।

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হলে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। এই ধৈর্য অবলম্বন করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সফলতা। বাড়িতে বৃদ্ধা মাতা অসুস্থ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না। স্ত্রীর পরনে কাপড় নেই, সন্তান-সন্ততি ছিন্ন পোষাকে রয়েছে, অর্থের অভাবে ভালো স্কুলে পড়ানো যাচ্ছে না। নিজের মাথা গোঁজার মতো একটি বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করতে হয়, বাড়ির মালিক কটু কথা শোনায়। অবৈধ সুযোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অবৈধ পথে অর্থোপার্জনের অনেক পথ খোলা রয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এসব অবৈধ পথ অবলম্বন করলেই অভাব মোচন হয়। কিন্তু যে কোনো অবৈধ পথ থেকে নিজেকে পরম ধৈর্যের সাথে বিরত রেখে সততার পথে অটল অবিচল থাকতে হবে।

যখন থেকে ঈমান আনা হলো, সেই মুহূর্ত থেকেই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানদারকে জীবনের প্রত্যেক পদে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। এদিক ওদিক হাত বাড়ালেই বিপুল অর্থের মালিক হওয়া যায়। সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাউকে একটু অবৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেই অঢেল অর্থ লাভ করা যায়, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করলেই অনেক কিছু লাভ করা যেতে পারে। এসব সুযোগ যখন সামনে উপস্থিত হয়, শয়তান তখন অভাব আর দৈন্যতার চিত্রগুলো দৃষ্টির সামনে প্রকট করে তোলে।

সুস্বাদু ফলের মৌসুম চলে যাচ্ছে, প্রতিবেশীর সন্তান সেই ফল খাচ্ছে আর নিজের সন্তান অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখছে। ছিন্ন পোষাকের কারণে সন্তানকে স্কুলের সহপাঠিরা বিদ্রুপ করে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর পরনের দামি শাড়ির দিকে নিজের স্ত্রী করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভালো তরকারী নেই, সন্তান-সন্ততি পেট ভরে ভাত

খায় না। অসুস্থ বৃদ্ধা মাতা ওষুধের অভাবে রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। এসব যন্ত্রণাদায়ক চিত্রগুলো শয়তান ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখের সামনে প্রকট করে তুলবে, যখন অবৈধ অর্থ লাভের সুযোগ সামনে এসে উপস্থিত হবে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করা বড়ই কঠিন, তবুও ঈমানদারকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে ইসলামের বিপরীত শক্তি বিশাল বিপুল শক্তি ও জাঁকজমক সহকারে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। অর্থ, জনশক্তি, উপায়-উপকরণ ও প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করে তারা ময়দানে তৎপরতা প্রদর্শন করে। অপরদিকে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত লোকগুলো সংখ্যায় তাদের তুলনায় নিতান্তই অল্প। এদের অর্থ নেই, জনশক্তি নেই, বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মতো তেমন কোনো উপায়-উপকরণও নেই। এই অবস্থায় এক শ্রেণীর লোক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে বলতে থাকে, এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ঐ বিশাল শক্তির সাথে কি মোকাবেলা করা সম্ভব? বদরের প্রান্তরে মুমিনদের সংখ্যা ছিল প্রতিপক্ষের তুলনায় নিতান্তই অল্প। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ–اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَبِرُوْنَ يَغْلِبُوْامِائَتَيْنِ–وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا–

হে নবী! মুমিন লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে দশ ব্যক্তি যদি ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুই শতের ওপর জয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এমন থাকে, তাহলে সত্য অবিশ্বাসীদের এক হাজার লোকের ওপর তারা বিজয়ী হতে পারবে। (সূরা আনফাল-৬৫)

ধৈর্যই সফলতার চাবিকাঠি। অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্য নামক সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করতে না পারলে কোনোক্রমেই সফলতা অর্জন করা যাবে না। প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁর জাতির পক্ষ থেকে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তারা ধৈর্যের বর্ম দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করেছেন। হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, যে সময় ইসলাম বিরোধিদের নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করেন না?' অর্থাৎ আমরা তো প্রতিপক্ষের নির্যাতনে শেষ হয়ে গেলাম, এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির জন্য আপনি কি মহান আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন না? আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, 'তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিন দল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর থেকেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়। আল্লাহর শপথ! এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বরামাউত পর্যন্ত নিশঙ্ক চিত্তে ভ্রমণ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

অর্থাৎ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে, তাহলেই সফলতা অর্জন করা যাবে। ধৈর্যের মধ্যে বিরাট বরকত রয়েছে। সূরা আনফালে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْـئـٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا–فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ–وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ–وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ–

অতএব তোমাদের মধ্যে যদি এক শত লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুইশতের ওপর আর হাজার লোক এমন হলে দুই হাজার লোকের ওপর আল্লাহর আদেশে বিজয়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সঙ্গী হন, যারা ধৈর্য ধারণকারী।

স্বাধীনভাবে আল্লাহর গোলামীর ক্ষেত্রে 'সবর'

এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পসন্দ করে কিন্তু বিষয়টি তার পরিচিত মহল বা কর্মক্ষেত্রে গোপন রাখে। মনে মনে চিন্তা করে, সে যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পসন্দ করে, এই কথাটি জানাজানি হয়ে গেলে

লোকজন তাকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়ীক, পশ্চাদপদ বলবে। কোনো ধরনের বিপদ-মুসিবত আসবে বা কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি চাকরী থেকেও বরখাস্ত করতে পারে, তখন অনাহারে থাকতে হবে। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের ওপরে যখন নির্যাতন চলেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তবুও তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা যে লোকগুলোকে খুঁজে বের করে নির্যাতন করছো, আমি সেই মুসলমানদেরই একজন।'

ধৈর্যের কোন্ সীমায় উপনীত হলে একজন মানুষ এভাবে নিজেকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে পারে, তা অনুধাবন করার বিষয়। আল্লাহর গোলাম হিসাবে নিজেকে গড়তে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে আল্লাহর গোলামী করতে হবে। আর আল্লাহর গোলামী স্বাধীনভাবে করতে গেলে যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তাই করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ
فَاعْبُدُوْنِ-كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ-ثُمَّ اِلَيْنَا
تُرْجَعُوْنَ-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّ
ئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ-الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ
رِزْقَهَا-اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ-وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো! আমার যমীন প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই বন্দেগী করো। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে আমি জান্নাতের উঁচু ও উন্নত ইমারতের মধ্যে রাখবো, যেগুলোর নিচে দিয়ে নদী বয়ে যেতে থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। কতই না উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের জন্য–তাদের জন্য যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রব-এর প্রতি আস্থা রাখে। কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা আনকাবূত-৫৭-৬০)

মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের লক্ষ্য করে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা যেখানে অবস্থান করছো, সেখানে যদি তোমরা আল্লাহর গোলামী করতে অপারগ হও, আল্লাহর গোলামী করার পরিবেশ না থাকে, আপন প্রভুর আইন-বিধান অনুসরণ করতে না পারো, তাহলে সেস্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহর পৃথিবী বিশাল-বিস্তীর্ণ, কোনো সঙ্কীর্ণ স্থান নয়। যেখানেই তোমরা স্বাধীনভাবে আপন প্রভুর গোলামী করতে পারবে, আল্লাহর বিধান স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে, সেখানে চলে যাও অর্থাৎ হিজরত করো। দেশ, জাতি ও চাকরীর মায়ায় এমন স্থানে থেকো না, যেখানে থাকলে আল্লাহর গোলামী করা যায় না। সুতরাং দেশ, জাতি ও চাকরীর গোলামী করো না, আল্লাহর গোলামী করো।

চাকরী, দেশ ও জাতিকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে যদি আল্লাহর গোলামী করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে এসব কিছুকে ত্যাগ করে আল্লাহর গোলামী করার দাবীকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এটাই ঈমানের পরিচয়। এই ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী, তারা চাকরী, দেশ ও জাতিকে অগ্রাধিকার দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা প্রকৃতই মহান আল্লাহর গোলামী করতে আগ্রহী, তারা দেশ ও জাতি প্রেমিক হতে পারে কিন্তু দেশ, জাতি ও চাকরীর পূজারী হতে পারে না। তার কাছে আল্লাহর গোলামী হয় সমস্ত কিছুর থেকে অধিক প্রিয় এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে সে আল্লাহর গোলামীর মোকাবেলায় বিকিয়ে দেয় কিন্তু পৃথিবীর কোনো স্বার্থের কাছে আল্লাহর গোলামীকে বিকিয়ে দেয় না।

আল্লাহর গোলামীকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে, নিজেকে কোরআনের অনুসারী বলে পরিচয় দিতে গেলে বা কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজে জড়িত, এই পরিচয় দিতে গেলে সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে অথবা প্রাণও হারাতে হতে পারে--এসব অমূলক চিন্তা যেনো তোমাদেরকে দুর্বল করতে না পারে। কারণ সম্মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ বা পৃথিবীর কোনো একটি স্বার্থও চিরস্থায়ী কোনো জিনিস নয়। এমনকি তোমার নিজের প্রাণও চিরস্থায়ী নয়। তোমার চোখের সামনেই দেখছো, একজন মানুষও চিরঞ্জীব নয়। একদিন না একদিন সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। চিরকাল থাকার জন্য কোনো একটি প্রাণের আগমনও এই পৃথিবীতে ঘটেনি।

সুতরাং এই পৃথিবীতে আল্লাহর গোলামীর পথ পরিহার করে কিভাবে নিজের সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা অক্ষুন্ন রাখবে এবং নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে চলবে, এসব বিষয় নিয়ে অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না। বরং চিন্তা করো, ঈমানকে কিভাবে হেফাজত করবে, আল্লাহর গোলাম হিসাবে কিভাবে নিজেকে সঠিক পথে অটুট রাখবে। কারণ শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। যদি পৃথিবীতে নিজের সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের আশায় ঈমানের পথ পরিহার করো, নিজের প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে ঈমান বিকিয়ে দাও, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং আমার দরবারে যখন তোমাদেরকে উপস্থিত হতেই হবে, তখন কি সম্পদ নিয়ে আমার সামনে দন্ডায়মান হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে জীবন পরিচালিত করো। দেশ, জাতি, সম্মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা ও প্রাণের জন্য ঈমানকে কোরবানী দেবে, না ঈমানকে হেফাজত করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত স্বার্থকে কোরবানী দেবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি মনে করে থাকো যে, পৃথিবীতে আমার বিধান অনুসরণ করে জীবন পরিচালিত করলে তোমরা পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, সম্মান-মর্যাদা তথা যাবতীয় নে'মাত থেকে বঞ্চিত হবে, লোকজন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদেরকে ব্যর্থ বলে উপহাস করবে–করুক না, কোনো পরোয়া করো না। যাবতীয় পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করো এবং বিশ্বাস করো তোমরা ব্যর্থ নও। হাশরের ময়দানে তোমাদের যাবতীয় অভাব শুধু পূরণ করাই হবে না, বরং তোমাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।

আপন রব-এর গোলামী করার কারণে যদি তোমাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হয়, নিজ জাতিকে ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ করো। এর উত্তম প্রতিদান আমি তোমাদেরকে দেবো। তোমাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম যদি এমন হয় যে, সেখানে আমার গোলামী করতে পারছো না। তাহলে সে মাধ্যম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। জীবিকার চিন্তায় আমার গোলামী থেকে বিরত থেকো না। পৃথিবীতে তোমাদের দৃষ্টির সামনে অসংখ্য-অগণিত পশু-প্রাণী রয়েছে, তারা জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি তাদেরকে প্রতিপালন করছে বা তাদের খাদ্য যোগাচ্ছে। আমি আল্লাহ তাদের খাদ্য যুগিয়ে থাকি। পানির অতল তলদেশে বা পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় ছোট্ট একটি পোকাও না খেয়ে থাকে না। যখনই তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আমি আল্লাহ তার রিযিক সরবরাহ করে থাকি।

সুতরাং স্বাধীনভাবে আমার গোলামী করার জন্য যদি তোমাদেরকে চাকরী হারাতে হয়, দেশ ত্যাগ করতে হয়, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তাহলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করো। ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করো। অসহায় প্রাণীকূলকে আমি রিযিক দিচ্ছি, তোমাদেরকেও আমিই রিযিক দেবো। রিযিক্-এর ব্যাপারে পেরেশান হয়ো না, ধৈর্য ধারণ করো–আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবো।

'হক'-এর দাওয়াতের ময়দানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন একটি সময় সামনে এসে উপস্থিত হয়, যখন একজন ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সহায়-সম্পদ ও নির্ভরতা থেকে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ উন্মুক্ত থাকে না। এই অবস্থায় যারা আগামী দিনে কিভাবে জীবন বাঁচাবে, রিযিক কোথা থেকে আসবে, মাথা গোঁজার ঠাঁই কোত্থেকে জুটবে, পরিবার, পরিজনের মুখে কি তুলে দেবে এসব চিন্তায় অস্থির হয়ে যায়, তাদের পক্ষে সফলতা অর্জন কখনো সম্ভব নয়।

এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে যারা একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে অসীম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে এবং প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৃঢ়পদে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, যে কোনো বিপদ-মুসিবতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকে, সফলতা তাদেরই পদচুম্বন করে। এই শ্রেণীর লোকদের অসীম ত্যাগ, কোরবানী আর অপরিসীম ধৈর্যের বিনিময়ে পৃথিবীর বাতিল শক্তি মাথানত করে এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।

অভিযোগহীন 'সবর'

বিপদ-মুসিবত, রোগ-শোক, ত্যাগ-তিতীক্ষা ইত্যাদির কঠিন ও বিভিষীকাময় স্তর অতিক্রম করলেই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করা যাবে। আর এসব পর্যায় অতিক্রম করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অভিযোগ না করে, চোখের পানি না ফেলে, কাকুতি-মিনতি না জানিয়ে, অস্থিরতা প্রকাশ না করে এবং চিত্ত চাঞ্চল্য না ঘটিয়ে অটল ও অবিচল থেকে যে ধৈর্যের প্রকাশ ঘটানো হয়, তাকেই সর্বোত্তম ধৈর্য বলা হয় এবং পবিত্র কোরআনে এই ধরনের ধৈর্যকে 'সাবরুন জামিল' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই ধরনের ধৈর্যই সবথেকে অধিক পসন্দনীয়। নবী-রাসূলদের জীবনে এই ধরনের 'সবর' ছিল তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। হযরত

ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে আগুনের কুন্ডে ফেলে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটেনি। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম সন্তান হারিয়ে এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেন, তিনি কোনো অভিযোগ করলেন না। হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের গোটা দেহে পচন ধরলো, তাঁর আপনজন তাঁকে ত্যাগ করলো, তিনি কোনো অভিযোগ করলেন না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হলো, তায়েফে হতাশাব্যঞ্জক কথা দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হলো, তায়েফের ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ উচ্ছৃঙ্খল যুবকদেরকে আল্লাহর রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দিলো। তারা একটির পর একটি পাথর ছুড়ে আল্লাহর নবীর পবিত্র দেহ মোবারক ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। আঘাতের যন্ত্রণায় রাসূলের পবিত্র পা দুটো আর উঠতে চায় না। তিনি হাঁটতে পারছেন না, বেঈমান-কাফিররা তাঁকে হাঁটতে বাধ্য করছে, তিনি যখনই হাঁটা শুরু করছেন অমনি তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকের ওপর পুনরায় পাথরের বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন তায়েফে আল্লাহর রাসূল তিনবার জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন।

জ্ঞান ফিরে আসা মাত্র তিনি রক্তাক্ত দুটো হাত আল্লাহর দরবারে উঠালেন, কিন্তু আঘাতকারীদের প্রতি কোনো অভিশাপ দিলেন না। বরং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এই লোকগুলো আমাকে চিনতে পারেনি। ওরা জানে না যে আমি তোমার নবী। ওরা না জেনে আমাকে আঘাত করেছে। আমাকে আঘাত করা হয়েছে, এ কারণে তুমি ক্রোধান্বিত হয়ে ওদের ওপরে গযব নাযিল করো না। তুমি যদি ওদেরকে গযব দিয়ে ধ্বংস করে দাও, তাহলে আমি দ্বীনের দাওয়াত দেবো কার কাছে?'

আল্লাহর ফেরেশ্তা দল মারাত্মকভাবে আহত নবীর কাছে এসে বলেছেন, 'আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন। আমরা এই পাহাড়গুলো উঠিয়ে তায়েফের কাফির-বেঈমানদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেই।' আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'ওদেরকে যদি তোমরা শেষ করে দাও, তাহলে আমি 'হক'-এর দাওয়াত কার কানে পৌছাবো?' এভাবে করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়েছেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। ওহুদের ময়দানে মুষ্টিমেয়

কয়েকজন জানবাজ সাহাবা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর নবীকে ঘিরে রেখেছেন। শত্রুদের অস্ত্রের সমস্ত আঘাত রাসূলের পবিত্র শরীরে যেন না লাগে, এ জন্য সাহাবাগণ রাসূলকে ঘিরে মানববন্ধন তৈরী করে নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছেন। তাঁকে হেফাজত করতে যেয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাত বরণ করলেন। কাফির বাহিনী নানা ধরনের অস্ত্র দিয়ে আল্লাহর নবীর ওপর আক্রমন করছিল।

এ সময় কাফেরদের তীরের আঘাতে হযরত কাতাদা ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ কোটর ছেড়ে বের হয়ে এলো। মুখের কাছে এসে চোখ ঝুলতে থাকলো। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর পাশে থেকে কাফিরদের দিকে তীর ছুড়তে থাকলেন। আল্লাহর রাসূল তুনীর থেকে তীর বের করে হযরত সা'দের হাতে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'হে সা'দ! তোমার ওপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক, তুমি তীর চালাও।'

হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীকে এমনভাবে বেষ্টন করেছিলেন যে, কাফিরদের সমস্ত আঘাতগুলো যেন তাঁর দেহেই লাগে, আল্লাহর রাসূল যেন অক্ষত থাকেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে তরবারী ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে আল্লাহর নবীর ওপর আক্রমনকারী কাফিরদেরকে প্রতিহত করছিলেন। এক সময় শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র হলো যে, মাত্র ১২ জন আনসার আর মক্কার মোহাজির হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত আর কেউ নবীর পাশে স্থির থাকতে পারলেন না।

এ অবস্থায় কাফিরদের প্রচন্ড আক্রমনের মুখে আল্লাহর রাসূল ঘোষনা করলেন, 'আক্রমনের মুখে শত্রুদেরকে যে ব্যক্তি পিছু হটতে বাধ্য করবে সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।' হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি শত্রুদেরকে আক্রমন করবো।' আল্লাহর রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন না। আনসারদের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আক্রমন করতে যাবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে শাহাদাতবরণ করলো। আল্লাহর রাসূল পুনরায় পূর্বের অনুরূপ ঘোষনা দিলেন। হযরত তালহা পুনরায় এগিয়ে এলেন। এবারও আল্লাহর রাসূল তাঁকে নিষেধ করলেন। এভাবে পরপর ১২ জন আনসারই শাহাদাতবরণ করলেন। এবার আল্লাহর রাসূল হযরত তালহাকে

এগিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। তিনি সিংহ বিক্রমে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মক্কার জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ সাহাবাদের বেষ্টনীর ওপর দিয়ে দোজাহানের বাদশাহকে আঘাত করার জন্য বারবার তরবারীর আঘাত হানছে। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শূন্য হাতে সে তীক্ষ্ণধার তরবারীর আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তরবারীর আঘাতে তাঁর একটা হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই, ঘাতকরা আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করছে। আর করুণার সিন্ধু সেই চরম মুহূর্তেও মহান আল্লাহর কাছে ঘাতকদের জন্য দোয়া করছেন, 'রাবিগ্‌ফিরলি ক্বাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন–হে আল্লাহ ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা যে কিছুই বুঝে না।'

সাহাবাগণ রাসূলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তীর এসে বিদ্ধ হতে পারে, আমরা আমাদের বুক দিয়েই তীর প্রতিরোধ করবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করছেন, সেই জালিমের দলই রাসূলকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এসে আঘাতের পরে আঘাত করছে। জালিম ইবনে কামিয়া তরবারী দিয়ে বিশ্বনবীর পবিত্র চেহারায় আঘাত করলো। তার তরবারীর আঘাতে আল্লাহর নবীর মাথার লোহার শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া ভেঙ্গে চেহারা মোবারকে প্রবেশ করলো। তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে বললেন, 'ঐ জাতি কি করে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয় ! অথচ সে নবী তাদেরকে আল্লাহর দিকেই আহ্বান করছে।'

কোনো কোনে বর্ণনায় এসেছে, হযরত তালহা স্বয়ং মারাত্মকভাবে আহত, একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গোটা দেহে তীর ও তরবারীর আঘাত। তবুও তিনি আল্লাহর রাসূলকে নিজের কাঁধের ওপরে নিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন। হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নিজের দেহের প্রতি সামান্য খেয়াল ছিল না। তাঁর দেহ থেকে ঝর্ণাধারার মতই রক্ত ঝরছিল।

সেদিকে তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি তখন অনুভব করছিলেন, আল্লাহর নবীকে হেফাজত করতে হবে। আল্লাহর নবীকে নিয়ে পাহাড়ের এক গুহায় পৌঁছে নবীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েই তিনি জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি আর হযরত উবাইদাসহ অনেকেই অন্য দিকে যুদ্ধ করছিলাম। নবীর সন্ধানে এসে দেখলাম তিনি আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমরা তাঁর সেবা-যত্ন করতে অগ্রসর হতেই তিনি বললেন, 'আমাকে নয়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা দেখলাম তাঁর জ্ঞান নেই এবং শরীর থেকে একটা হাত বিচ্ছিন্ন প্রায়। গোটা শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ৮০ টিরও বেশী আঘাত ছিল তাঁর শরীরে। আল্লাহর রাসূল পরবর্তী কালে হযরত তালহা সম্পর্কে বলতেন, 'কেউ যদি কোন মৃত মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণশীল দেখতে চায়, তাহলে সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।'

হযরত তালহাকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হত। ওহুদের প্রসঙ্গ উঠলেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলতেন, 'সেদিনের যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত তালহা।' আল্লাহর নবী হযরত তালহাকে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফিরদের আঘাতে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র দান্দান মোবারক শাহাদাতবরণ করেছিল। তাঁর চেহারা মোবারকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন আর হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবীর ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। রক্ত যখন বন্ধ হলো না, তখন বিছানার একটা অংশ পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে দেয়ার পরে রক্ত বন্ধ হয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে যারা তৎপর রয়েছেন, 'সবর' তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। আল্লাহর জান্নাত এমনিতেই লাভ করা যাবে না। বাতিলের মোকাবেলায় ও বিপদ-মুসিবতে 'সবর' তথা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جٰهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِينَ–

তোমরা কি মনে করেছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি, তোমাদের মধ্যে কারা তাঁর পথে জিহাদ করতে এবং 'সবর' অবলম্বন করতে প্রস্তুত? (সূরা ইমরাণ-১৪২)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতই মুজাহিদ এবং কোন্ ব্যক্তি যাবতীয় বিপদ-মুসিবত ও শত্রুর মোকাবেলায় হিমাচলের মতোই অটল অবিচল থেকেছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ -

অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো, যাতে করে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদ এবং দৃঢ়তা ও সবর অবলম্বনকারী কে তা আমি দেখে নিতে পারি এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি। (সূরা মুহাম্মাদ-৩১)

'সবর'-এর উত্তম প্রতিদান

'সবর' পবিত্র কোরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি শব্দ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থানে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণত 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে, অবিচলতা, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, মন-মেজাজের সমতা, ধীরতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও বরদাস্ত করা। এ ছাড়াও 'সবর' শব্দটি বহুবিদ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, 'সবর' শব্দের অর্থ হলো ধৈর্য। 'সবর'-এর একটি অর্থ ধৈর্য এ কথা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু ধৈর্যের অর্থ এটা নয় যে, কেউ একজন অন্যায়ভাবে আঘাত করলো আর আঘাতকারীর প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে বলা হলো, আপনি স্বয়ং আঘাত পাননি তো!

এর নাম 'সবর' নয়, বরং 'সবর' হলো বিপদে হতাশ না হয়ে, ভেঙ্গে না পড়ে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে অটল অবিচল থাকা। ঠান্ডা মাথায়, ধীর স্থির মস্তিষ্কে বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলা করে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার কৌশল অবলম্বন করার নামই হলো 'সবর'। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে অবিচলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে। বিষয়টি স্পষ্ট অনুধবান করার জন্য সেই গল্পটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়, সে গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি বিষধর সাপ একজন পীর সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছিলো, 'হুজুর, আমি আপনার মুরীদ হতে এসেছি।' পীর সাহেব সেই সাপকে বললেন, 'আমি তো কোনো সাপকে মুরীদ করিনা।'

সাপ অনুনয় করে বললো, হুজুর আমি বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি মুরীদ হবার জন্য। আপনি দয়া করে আমাকে মুরীদ করে নিন।' সাপের পীড়াপিড়ীতে

অবশেষে পীর সাহেব বললেন, 'আমি তোমাকে আমার মুরীদ করতে পারি এক শর্তে। সে শর্তটি হলো, তুমি কাউকে দংশন করতে পারবে না।' সাপ বিনয়ের সাথে জানালো, 'আপনার শর্ত আমি মেনে নিলাম। আর কখনো কাউকে আমি দংশন করবো না।'

পীর সাহেব সাপকে মুরীদ বানিয়ে তাকে কিছু যিকর শিখিয়ে দিলেন। সাপ বিদায় নিয়ে চলে গেলো এবং একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পীর সাহেবের শিখানো যিকর করতে থাকলো। সেই ক্ষেতের মালিক ক্ষেতে এসে ধান কাটতে লাগলো। সন্ধ্যার পরে লোকটি কাটা ধানের গোছাগুলো বোঝা বেঁধে বাড়িতে নিয়ে যাবে, কিন্তু বোঝা বাঁধার রশি সে সাথে আনেনি। এদিক ওদিক সে রশির আশায় তাকালো। সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে ছেয়ে গিয়েছে। সাপকে লোকটি রশি মনে করে উঠিয়ে নিয়ে ধানের গোছাগুলো একত্রিত করে শক্ত করে বাঁধলো। লোকটি রশি মনে করে সাপকে দিয়ে যখন ধানের গোছা বাঁধছিলো, সাপ তখন রাগে ফুঁসছিলো আর মনে মনে বলছিলো, 'ব্যাটা আহাম্মক, আমাকে তুমি রশির মতো ব্যবহার করছো। আমি যদি পীর সাহেবের মুরীদ না হতাম, তাহলে এতক্ষণে তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিতাম।'

রশি হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে সাপকে দুমড়ানো মোচ্‌ড়ানো হয়েছে। ফলে সাপের ঘাড় মচ্‌কে গেলো। লোকটি ধানের বোঝা বাড়িতে নিয়ে সেই সর্প রূপী রশি ফেলে দিলো। সাপ অনেক কষ্টে পীর সাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে করুণ স্বরে জানালো, 'আপনি এমন এক যিকর আমাকে শিখিয়েছেন, যে যিকর করতে গিয়ে আমার ঘাড় মচকে গিয়েছে।' পীর সাহেব অবাক কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য কথা! যিকর করলে মন-মানসিকতা পবিত্র হয়, কারো ঘাড় তো মচ্‌কে যায় না। তোমার ঘাড় কেমন করে মচ্‌কালো?'

সাপ তখন সম্পূর্ণ ঘটনা পীর সাহেবকে শুনালো। ঘটনা শুনে পীর সাহেব সাপকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ব্যাটা আহাম্মক! আমি তোমাকে দংশন করতে নিষেধ করেছি কিন্তু ফোঁস করতে তো নিষেধ করিনি। যখন তোমাকে রশি ভেবে তোমার শরীরে হাত দিয়েছিলো, তখন যদি তুমি ফোঁস করে উঠতে, তাহলে তিন লাফ দিয়ে লোকটি ছুটে পালাতো, তোমার ঘাড় মচ্‌কাতো না।'

সুতরাং ধৈর্যের অর্থ এটা নয় যে, অকারণে একজনের ওপরে নির্যাতন করা হবে আর নির্যাতিত ব্যক্তি নীরবে তা সহ্য করে বলবে, 'আমি ধৈর্য ধারণ করছি, কারণ

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে বলেছেন, তিনি ধৈর্যশীল লোকদের সাথে থাকেন।' এর নাম ধৈর্য নয়। যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি, বিপদ-মুসিবত মোকাবেলা করতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, অবিচলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে, আর এটার নামই হলো 'সবর'। এই 'সবর' যারা অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ–

তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো তাহলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল-১২৬)

ধৈর্য ধারণকারীদের বা 'সবর' অবলম্বনকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, এর অর্থ হলো–যারা লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার মোকাবেলায় সত্য ও সততা এবং ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়-নীতির পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এসব ক্ষতি যারা কোনো ধরনের অভিযোগ ব্যতীতই বরদাশ্‌ত করে। পৃথিবীতে অবৈধ পথ অবলম্বন করলে যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যেতো, তা সবই যারা ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করেছে। যারা ভালো কাজের শুভ প্রতিদান লাভ করার জন্য পরম ধৈর্যের সাথে মৃত্যুর পরের জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। ধৈর্য ধারণকারী এসব লোকদের জন্য মহান আল্লাহ বিরাট নে'মাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ–وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা 'সবর'-এর পথ অবলম্বন করবে তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। (সূরা নাহ্‌ল-৯৬)

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যারা 'সবর' অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হিসাব করে কোনো প্রতিদান দেবেন না। সীমা সংখ্যাহীন বেশুমার প্রতিদান 'সবর' অবলম্বনকারীদেরকে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে। (সূরা যুমার-১০)

ঈমান এনে, আমলে সালেহ্ করে এবং 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যারা ইসলাম বিরোধিদের জুলুম-নির্যাতন ও অপবাদ-মিথ্যাচারের মোকাবেলা সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সাথে করবে, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত ও তার সম্মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে যে কোনো ধরনের বিপদ-মুসিবত এবং কষ্ট বরদাশ্‌ত করবে, যাবতীয় ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সততা অবলম্বন করে দৃঢ়পদ থাকবে, শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা-বাসনাকে অবদমিত করে দ্বীনি আন্দোলনে অটল থাকবে, অবৈধ পথ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করবে, পাপের যাবতীয় স্বাদ ও লাভ প্রত্যাখ্যান করবে এবং সৎকাজ ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার পরিবর্তে অর্জিত অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করবে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে সম্বর্ধনা দেবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা ফুরকানে বলেন–

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَمًا- خَلِدِيْنَ فِيْهَا-حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا-

এরা হলো সেসব লোক, যাদের প্রদান করা হবে উন্নত মন্‌জিল। এটা তাদের সবরের প্রতিফল। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

'সবর' অবলম্বনকারীদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করবেন। জান্নাতে ফেরেশ্‌তারা চারদিক থেকে এসে তাদেরকে সালাম জানাবেন এবং এই সুসংবাদ দেবেন যে, তোমরা এখন এমন স্থানে এসে পৌঁছেছো যেখানে শান্তি আর নিরাপত্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই। এখানে তোমরা যাবতীয় বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। কোনো শঙ্কা বা ভয়-ভীতির আশঙ্কা এখানে নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ-سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

ফেরেশ্‌তাগণ চারদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে। এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষনের ধারা অব্যাহত থাক। তোমরা পৃথিবীতে যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, তার বিনিময়ে তোমরা এর অধিকারী হয়েছো। সুতরাং কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর! (সূরা রা'দ-২৩-২৪)

প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারদের সারা বৈষয়িক জীবনই হলো 'সবর'-এর জীবন, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার কঠিন জীবন। জ্ঞানের উন্মেষ হওয়া অথবা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের নফস-এর অবৈধ কামনা-বাসনা দমন করা, মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে চলা, যে কাজগুলো আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করে দিয়েছেন তা তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের সময়, মেধা, শ্রম, ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা-প্রতিভা, প্রয়োজনে নিজের প্রাণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য কোরবান করা, যে কোনো বিপদ-মুসিবতে অটল-অবিচল থাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যারা করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে তাদের সম্পর্কে সূরা দাহার-এ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا-وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا-مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ-لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا-وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا-وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا-وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا-عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا-وَيَطُوْفُ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ-اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا-وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا-عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ-وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ-وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا-اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا

অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সেদিনের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ-স্ফূতি দান করবেন। আর তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। সেখানে তারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তাদেরকে সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না, শীতের প্রকোপও নয়। জান্নাতের বৃক্ষ রাজির ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে এবং তার ফলমূল সবসময় তাদের আয়ত্তাধীনে থাকবে (তারা ইচ্ছানুসারে তা ভোগ করতে পারবে)। তাদের সম্মুখে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা পরিবেশন

করানো হবে। সেই কাঁচ পাত্রও রৌপ্য জাতীয় হবে। এবং সেগুলো (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মত পূর্ণ করে রাখবে! তাদেরকে সেখানে এমন সূরাপাত্র পরিবেশন করানো হবে যাতে শুকনা আদার সংমিশ্রণ থাকবে।

এটা হবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, যাকে সালসাবীলও বলা হয়। তাদের সেবাকার্যে এমন বালক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। তোমরা সেখানে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, শুধু নে'মাত আর নে'মাতই তোমাদের চোখে পড়বে এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমারা দেখতে পাবে। তাদের ওপর সুক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক অথবা মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন পরানো হবে এবং তাদের রব তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। এটাই হলো তোমাদের শুভ প্রতিফল। কারণ তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবান রূপে গৃহীত হয়েছে। (সূরা দাহার)

মানুষ মাত্রেই ভুল-ক্রটি রয়েছে, তার আমলনামায় কম-বেশী গোনাহ্ রয়েছে। তবে যারা ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ্ করেছে, 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছে এবং এই কাজ করতে গিয়ে যেসব বিপদ-মুসিবত এসেছে, তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ-أُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ-

যারা ধৈর্য অবলম্বন করেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান। (সূরা হূদ-১১)

ঈমানের প্রভাবে ইতিহাসের বিস্ময়কর বিপ্লব

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো, একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। মানবতা মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলো এবং পৃথিবী তার যাবতীয় উপকরণসহ ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চলছিলো। রাসূলের আবির্ভাবকালে সারা পৃথিবীর অবস্থা সেই ঘরের অনুরূপ ছিলো, যার ভিত্তি এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের তীব্র আঘাতে ভঙ্গুর করে দিয়েছিলো। পৃথিবীর

মানুষগুলোর অস্তিত্ব নিজেদের দৃষ্টিতেই নিজেরা যেন ছিলো নগণ্য ও মূল্যহীন। বৃক্ষ, তরু-লতা, প্রস্তরখন্ড, আগুন-পানি ও উর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্র এবং তারকারাজিসহ বস্তুমাত্রই উপাস্য হিসাবে মানুষের কাছে পূজিত হচ্ছিলো।

মানুষের চিন্তার জগতে এতটাই স্থবিরতা ও বিশৃংখলতা নেমে এসেছিলো যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থুল সত্যগুলো অনুধাবন করতেও তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলো এবং তাদের অনুভূতি ভুল পথে চলছিলো। স্থুল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে সূক্ষ্ম ও অবোধগম্য এবং সূক্ষ্ম ও অবোধ্যগুলোও তাদের কাছে স্থুল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিলো। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত এবং সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ও তাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। রুচি তাদের এতটাই বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, তিক্ত ও বিস্বাদ জিনিসও সুস্বাদু এবং সুস্বাদু জিনিসও তাদের কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ বলে বোধ হচ্ছিলো। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো–ফলে বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্খীদের সাথে শত্রুতা এবং শত্রু ও অকল্যাণকামীদের সাথে ছিলো তাদের গভীর বন্ধুত্ব ও মিত্রতা।

তদানীন্তন পৃথিবীতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি বস্তুই যেন ভুল আকার-আকৃতিতে ও ভুল স্থানে সজ্জিত ছিলো। সে সমাজে অরণ্যে বসবাসের উপযোগী হিংস্র নেকড়ে তুল্য মানুষগুলোকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হয়েছিলো। সে সমাজে দুরাচারী–অপরাধীরা ছিলো সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত আর সদাচারী চরিত্রবান লোকগুলো ছিলো অপাংক্তেয়, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সদাচরণ এবং সচ্চরিত্রতার চাইতে বড় অপরাধ ও বোকামি আর অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণের চাইতে বড় যোগ্যতা ও গুণ সে সমাজে আর কিছুই ছিলো না। গোটা সমাজের আচার-আচরণ ছিলো ধ্বংসাত্মক যা সারা দুনিয়াকেই ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত করেছিলো। শাসক শ্রেণী ও বিত্তবানরা অর্থ-সম্পদকে হাতের ময়লা এবং সাধারণ মানুষগুলোকে নিজেদের ক্রীতদাস মনে করতো। তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ সাধারণ মানুষের প্রভুর আসন দখল করেছিলো। তারা সাধারণ লোকদের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করতো এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানবীয় গুণাবলীকে অত্যন্ত নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করা হচ্ছিলো অথবা অপাত্রে ব্যয় করা হচ্ছিলো এবং মানবীয় গুণাবলী থেকে কোনো

উপকার গ্রহণ বা যথাস্থানে তা ব্যবহার করা হচ্ছিলো না। বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ব্যবহৃত হচ্ছিলো অন্যায়-অত্যাচারের ক্ষেত্রে। উদারতা ও বদান্যতা ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপব্যয় ও অপচয়ে। আত্মমর্যাদাবোধ ব্যবহৃত হচ্ছিলো অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায়। ধীশক্তি ও মেধা ব্যবহৃত হচ্ছিলো প্রতারণা ও অপকৌশলে। জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপরাধের নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির নতুন নতুন উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে।

তদানীন্তন পৃথিবীতে মানব সম্পদ সুদূর অতীতকাল থেকেই বিনষ্ট হচ্ছিলো। সে সময়ে মানুষই ছিলো এমন কাঁচামাল যার ভাগ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোনো কারিগর জোটেনি–যিনি মানব সম্পদ ব্যবহার করে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন। মানুষগুলো ছিলো যেন সেই মূল্যবান শস্যক্ষেত্র, যা আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। এমন কারো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই আগাছা উৎপাটিত করে শস্য ক্ষেত্রসমূহ শস্য ফলনের উপযোগী করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। সংগঠিত ও সুশৃংখল জাতি-গোষ্ঠী ছিলো না, রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত হতো সেই বদ্ধ উন্মাদদের দ্বারা, যারা সেই শক্তি ব্যবহার করতো ধ্বংসাত্মক পন্থায়। আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত বিকৃত জীবন-যাপন করছিলো।

যেসব বস্তু ছিলো মানুষের অধীন এবং পৃথিবীতে যা অস্তিত্ব লাভ করেছে মানুষেরই কল্যাণের জন্য, যেসব বস্তু মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং যাদের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি-পুরস্কার দেয়ার একবিন্দু ক্ষমতা নেই, মানুষ সেসব বস্তুকে উপাস্য জ্ঞানে তার সামনে মাথানত করতো। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষগুলো এমন বিকৃত ধর্মের অনুসারী ছিলো, আখিরাতের জীবন দূরে থাক–চলমান জীবন-যিন্দেগীতে যার কোনোই প্রভাব ছিলো না এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রে, মন-মস্তিষ্কে ও আত্মার ওপর যার কোনোই ক্ষমতা ছিলো না।

ধর্মজ্ঞানে তারা যা অনুসরণ করতো, চরিত্র ও সমাজ সেই ধর্ম দ্বারা আদৌ প্রভাবিত ছিলো না। তাদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এমন ছিলো যে, যেমন একজন শিল্পী বা কারিগর তার কর্ম শেষ করে ক্লান্তি জনিত কারণে বিশ্রামের জন্য নির্জনতা বেছে নিয়েছেন এবং পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যটি সেইসব লোকদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সমাজে যারা বিত্তবান এবং ধর্মীয় আসনে আসীন। এখন তারাই পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিপতি। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের ভাগ্য নিয়ন্তা তারাই এবং সমস্ত কিছুই তাদের ব্যবস্থাপনাধীন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে অধিক কিছু ছিলো না। ইতিহাসের কোনো ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আণবিক বোমা প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়েছিলো, ছাত্রটি তার সঠিক উত্তর দেবে বটে– কিন্তু সঠিক উত্তর বলার সময় তার মন-মস্তিষ্ক আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতার ভয়ে আতঙ্কিত হবে না এবং তার ওপর কোনো প্রভাবও পড়বে না। ঠিক তেমনি ছিলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না, ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান–তাদের দৈনন্দিন জীবনধারায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতো না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁর প্রতি অনুরাগ, ভয়, শ্রদ্ধা ছিলো না, তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও বড়ত্বের কোনো চিত্র তাদের হৃদয়ে ছিলো না। মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিলো অস্পষ্ট, যার ভেতরে কোনো গভীরতা ও শক্তি ছিলো না। ফলে সেই ঈমানের বাস্তব রূপায়নও ছিল তাদের চরিত্রে অনুপস্থিত।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী ও রিসালাতসহ প্রেরণ করলেন, যাতে করে তিনি মুমূর্ষ মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। বিশ্বনবীর আবির্ভাব মানবমন্ডলীকে নবজীবন, নতুন আলোক-রশ্মি, নতুন উত্তাপ, নবতর শক্তি, নবতর প্রত্যয়, নতুন কৃষ্টি-সভ্যতা ও নতুন সমাজ দান করলো। তাঁর আগমনে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস এবং মানব জাতির কর্মে নবজীবনের সূত্রপাত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিলেন। তিনি যে বিধান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করলেন, তা বাস্তবে অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা ঈমান আনলো, তাদের স্বভাব-চরিত্রে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো এবং এই ঈমানদার লোকগুলোর দ্বারা মানব সমাজে যে বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলো–ইতিহাসের বুকে তা ছিলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

এই বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিলো একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, গভীরতা, বিশালতা ও সার্বজনীনতা, বিস্তৃতি এবং মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া–এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর বিপ্লবের অনন্যদিকসমূহ। রাসূল কর্তৃক সাধিত এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোনো জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য ছিলো

না। এটা ছিলো ঈমানী বিপ্লব এবং সেই ঈমান তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্লাবিত করে বাস্তব জীবনের প্রত্যেক দিক ভাসিয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাঁদেরকে ঈমানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। এই ঈমানই তাদের দৈহিক পবিত্রতা ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এনেছিলো এবং হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি সৃষ্টি করেছিলো। মহান আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন এবং শুনছেন, তাঁর কাছে পার্থিব জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর হিসাব দিতে হবে—ঈমান এই অনুভূতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো। ফলে তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর সমীপে ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত অবস্থায় দন্ডায়মান হতেন এবং রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়তেন।

ঈমান তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, মনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি এবং নফসের তথা প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। ঈমানই তাঁদের মধ্যে উর্ধ্বজগৎ ও যমীনের মালিকের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধিই করছিলো এবং তাঁদেরকে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের পথে অগ্রসর করিয়েছিলো। রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও যুদ্ধ-মারামারি তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত ছিলো এবং অস্ত্রের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো মজ্জাগত। ঈমান তাদের সেই হিংস্রতা ও সামরিক স্বভাব-প্রকৃতিকে এবং আরবীয় অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের সামনে তাঁরা মোমের মতোই গলে পড়তেন। সামান্যতম কাপুরুষতা যাদের চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যেতো না, তাঁরাই ঈমানের প্রভাবে অবৈধ কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিতেন। ঈমানের প্রভাবে তাঁরা এমন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সহ্য করেছিলেন, পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায় অথবা কোনো জাতি-গোষ্ঠী সহ্য করেনি।

চিন্তার জগতে ঈমানের প্রভাব

পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করতে পারবে না, যেখানে কোনো ঈমানদার মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে হিংসা, জিঘাংসা, রক্তপাত, মারামারি বা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিররা মদীনার আনসারদের সাথে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো, অথচ ঈমান ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো যোগসূত্র ছিলো না। ইতিহাসে আদর্শের শক্তি ও প্রভাবের এটাই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের প্রাণের

দুশমন ছিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের পরম আপনজনকে হত্যা করেছিলো। অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তাদের ভেতরে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না এবং মমতার বাগডোরে তাদেরকে বাঁধা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিয়ে গভীর মমতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলো। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ঈমানের কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই শক্তিশালী সম্পর্কের রূপ নিয়েছিলো, যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধুত্বই ম্লান ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান চালালেও এই ধরনের নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

নবোত্থিত ঈমানদারদের এই দলটি ছিলো এক বিশাল ইসলামী উম্মাহর ভিত্তি। ঈমানদারদের এই দলের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সঙ্কট সন্ধিক্ষণে হয়েছিলো যখন পৃথিবী ধ্বংসের একপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। ঈমানদারদের দল পৃথিবীকে ধ্বংসের প্রান্ত থেকে সরিয়ে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো, যে বিপদ পৃথিবীর সামনে মুখ ব্যাদন করে অপেক্ষা করছিলো। ঈমানদারদের ঐ দলের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। ঈমানের কারণে তাঁদের ভেতরে দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল পিপাসা সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহর দ্বীনকে উপলব্ধি করার তৃষ্ণা এবং আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটেছিলো। সুখে দুঃখে যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার অনুপ্রেরণা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিলো। যে অবস্থায়ই তাঁরা থাকুন না কেনো, ঈমান তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করতো।

ঈমান তাঁদের মধ্যে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজ-সাধ্য বিষয়ে পরিণত করেছিলো। ফলে পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত সহ্য করায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঈমান আনার পূর্বে তাঁরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং আল্লাহর কোরআনের অসংখ্য আদেশ-নিষেধের সাথে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। ব্যক্তিগত বিষয়, নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের

সম্পর্কে ও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা খুব সহজ-সাধ্য বিষয় ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ঈমানই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা তাঁদের অভ্যাসে পরিণত করেছিলো। তাঁরা ঈমান আনার ব্যাপারে শুধু মাত্র কালেমা পাঠের জন্য নিজের কণ্ঠকেই ব্যবহার করেননি, বরং তাঁদের মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঈমানের ছায়াতলে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

ঈমান আনার পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদের কখনো মানসিক অথবা আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর রাসূল যা সিদ্ধান্ত দিতেন, সে ব্যাপারে তাঁদের সামান্যতম মতানৈক্যের অবকাশ থাকতো না। একমাত্র ঈমানই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের গোপন ভুল-ভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য করতো এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাণদন্ড তুল্য সংঘটিত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করতো।

নিজের অজান্তে কোনো সময় পাশবিক শক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটেছে যখন কোনো মানব চক্ষু তা অবলোকন করেনি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে আইনের ধারা-উপধারা গ্রেফতার করতে অক্ষম হয়েছে, এ অবস্থায় ঈমানই তখন তীব্র ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছে। ঈমানের রশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পা এমনভাবে বেঁধেছে যে, সে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

ঈমান তার মন-মস্তিষ্কে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করেছে। তার ভেতরে গোনাহর স্মরণ ও পরকালের শাস্তির বিষয়টি এমন পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তার জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে গোপনে সংঘটিত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে কঠিন দন্ড ভোগের জন্য নিজেকে পেশ করেছে। এরপর নির্ধারিত চরম দন্ড সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে এবং হাসি মুখে দন্ড ভোগ করেছে যেন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির মোকাবেলায় পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করে হাশরের ময়দানে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারে। ঈমানই ছিলো তাঁদের আমানত, সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ।

প্রকাশ্যে-গোপনে, নীরবে-নির্জনে ও জনসমাবেশে ঈমানই ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। যেখানে দেখার মতো কেউ থাকতো না, এমন নীরব নির্জন স্থান, যেখানে একজন মানুষের পক্ষে যা খুশী তাই করার পূর্ণ সুযোগ থাকতো, যেখানে কেউ দেখে ফেলবে-এই ভয় ছিলো না-সেখানেও একমাত্র ঈমানই তাঁদের নফস তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও নিষ্ঠার এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র ঈমানী শক্তির কারণেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছিলো।

তারীখে তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওহীদের বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাজে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তুপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।' এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, 'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'

লোকটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বললো, 'বিষয়টি যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, 'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে–অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো বিনিময় দিতে চান, তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।' কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের।

ঈমান জাগতিক ভয়-ভীতি দূর করে দিয়েছিলো

তাওহীদের প্রতি ঈমান তাঁদের মাথা করেছিলো উঁচু এবং গর্দান করেছিলো উন্নত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি তথা রাজা-বাদশাহ্, শাসকগোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজের কোনো শক্তিশালী লোকের সামনে তাঁদের মাথা নত হবে–এটা ছিলো তাঁদের কল্পনার অতীত। ঈমানী চেতনা তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'য়ালার মহানত্ব ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো। জাগতিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, পৃথিবীর চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রদর্শনীর কোনো মূল্যই তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো না। তাঁরা যখন পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠীর জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তাঁরা দেখতেন–এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরম তুষ্ট রয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ্ যেন মাটির বানানো পুতুল–যাদেরকে মূল্যবান পোষাকে আবৃত করে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজদরবারে যাতায়াতকারী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাহ্কে সিজ্দা দিতে ব্যস্ত, তখন রাজদরবারে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষণা করলেন, 'আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না।'

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কাছে দূত হিসাবে হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, মহামূল্যবান বস্তু দ্বারা রাজদরবার সজ্জিত, পায়ের নীচের কার্পেট থেকে শুরু করে রুস্তমের দেহের পোষাক ও বসার আসন মহামূল্যবান মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত এবং রুস্তমের মাথায় হিরা-জহরত খচিত মুকুট। অথচ হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পরনে সাধারণ পোষাক, তাঁর সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর বর্শা, মাথায় শিরস্ত্রাণ–দেহ বর্মাবৃত। তিনি রুস্তমের দরবারের সেই মহামূল্যবান গালিচার ওপর দিয়েই নিজের ঘোড়া চালিয়ে রুস্তমের মুখোমুখি হলেন। দরবারের লোকগুলো তাঁকে সামরিক সরঞ্জাম ত্যাগ করে রুস্তমের সামনে যেতে উপদেশ দিলো।

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছো। আমার অবস্থা যদি তোমাদের দরবারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা না করো, তাহলে আমি এখনই ফিরে যাবো।' রুস্তম তার

দরবারের লোকদের বাধা দিয়ে বললো, 'তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই আসতে দাও।' হযরত রিবঈ বর্শার সূচালু অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দরবারে বিছানো কার্পেট মাড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন আর তার বর্শার অগ্রভাগের চাপে কার্পেট কয়েক স্থানে ছিদ্র হয়ে গেলো। রুস্তমের লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছো?

তিনি ঈমান দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে সোপর্দ করার জন্যই এসেছি। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি চলছে, তা থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে টেনে নেয়ার জন্যই এসেছি।' মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁদের হৃদয়ে এমনই নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো–যা ছিলো বিস্ময়কর! আল্লাহর প্রেমে তাদেরকে মশগুল করেছিলো এবং জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহশীল আর পৃথিবীর জীবনের প্রতি চরমভাবে বীতস্পৃহ করেছিলো। আখিরাতের জীবন ও জান্নাতের চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সামনে এমনভাবে ভেসে উঠতো যে, সেই চিরস্থায়ী শান্তির জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা সামান্য কয়েকটি খেজুর খাওয়ার সময়ও ব্যয় করেননি, দুনিয়ার সমস্ত পিছুটানের প্রতি পদাঘাত করে শত্রু বুহ্যে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছেন।

ওহুদের ময়দানে সেই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে হযরত আনাস ইবনে নযর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা প্রবল বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআযের সাথে দেখা হতেই তিনি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই সা'দ, আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ওহুদ পাড়ারের ওপাশ থেকে আমি জান্নাতের ঘ্রাণ অনুভব করছি।' হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমরা দেখতে পেলাম আনাস ইবনে নযর শহীদদের মিছিলে শামিল হয়েছেন। তাঁর দেহে ৮০ টিরও অধিক আঘাত ছিলো, প্রত্যেকটি আঘাত ছিলো সামনের দিকে এবং তাঁকে এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছিলো যে, তাঁকে চেনার কোনো উপায় ছিলো না। তাঁর বোন তাঁর একটি অক্ষত আঙ্গুল দেখে তাঁকে শনাক্ত করেছিলো।

হযরত আবু বকর ইবনে আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমার আব্বা ছিলেন শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি এবং তিনি ঘোষণা

করছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।' তাঁর ঘোষণা শুনে এমন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো, যাঁর পরনে ছিলো জীর্ণ পোষাক। লোকটি বললো, হে আবূ মূসা! তুমি কি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলকে এই কথা বলতে শুনেছো?' তিনি জানালেন, 'হ্যাঁ, আমি নিজের কানে আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে এই কথা শুনেছি।' তখন লোকটি নিজের পরিচিতজনদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'তোমরা আমার জীবনের শেষ সালাম গ্রহণ করো।' এ কথা বলেই সে তাঁর তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে কোষমুক্ত তরবারি হাতে শত্রু বুহ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করলো।

ওহুদের রণপ্রান্তরে ইসলামের শত্রুরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আক্রমন করতে বদ্ধপরিকর। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহক। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তাঁর দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তিনি রাসূলের দেহে সামান্যতম আঘাত বরদাস্ত করবেন না। আল্লাহর নবীর দিকে কাফের বাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক হাতে পতাকা আরেক হাতে তরবারী নিয়ে রাসূলকে নিজের পেছনে রেখে কাফেরদের আক্রমন প্রতিহত করতে থাকলেন।

কাফেরদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি তাদের সামনে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুখ দিয়ে ভীতিকর শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁর এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করার কারণ হলো, কাফেরদের দৃষ্টি রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে নিজের ওপরে নিয়ে আসা। রাসূল যেন নিরাপদে থাকতে পারেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এভাবে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্ত্বাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। তিনি কাফেরদের সামনে ঢালের মতই ভূমিকা পালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর দেহের ওপর দিয়েই আল্লাহর রাসূলকে আক্রমন করছিল।

শত্রুদের তীব্র আক্রমনের মুখে যখন মুসলিম সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো, তখন হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একাকী শত্রুর সামনে পাহাড়ের মতই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাসূলকে আঘাতকারী জালিম ইবনে কামিয়াহ এগিয়ে এলো। হযরত মুসআব তাকে বাধা দিলেন। পাপিষ্ঠ কামিয়াহ তরবারী দিয়ে আঘাত করে হযরত মুসআবের ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সাথে সাথে তিনি বলে উঠলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ-
اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ-

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তার আদর্শের বিপরীত পথে চলবে? (সূরা ইমরান-১৪৪)

কাফেরদের তরবারীর আরেকটি আঘাতে হযরত মুসআবের দ্বিতীয়টি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবারও তিনি পূর্বের মতই ঐ কথাটি উচ্চারণ করলেন। তিনি তাঁর কাটা হাতের বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা জড়িয়ে ধরে উড্ডীন রাখলেন। ইসলামের শত্রুরা এবার তাঁর ওপর বর্শার আঘাত হেনে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিল। শাহাদাতের অমিয় সুধা তিনি পান করলেন। তিনি যে মুহূর্তে শাহাদাত বরণ করেন, সে সময়ের সবচেয়ে অলৌকিক ঘটনা হলো, ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে বার বার আঘাত পেয়ে তিনি যে কথাটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন, সেই কথাটিই পরবর্তীতে হু-বহু কোরআনের আয়াত হিসাবে আল্লাহর রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত পরে তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিবেন, সেই সিদ্ধান্তই তিনি তাঁর এক প্রিয় বান্দার মুখ দিয়ে তাঁর শাহাদাতের মুহূর্তে যেন জানিয়ে দিলেন।

হযরত মুসআব ইসলামের শত্রুদেরকে এবং মুসলমানদেরকে যেন স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল মাত্র। তিনি মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়ে এক সময় এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করবেন। ইতোপূর্বেও নবী রাসূলগণ এভাবে সত্য পৌঁছে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যে সত্য পৃথিবীতে এনেছিলেন তাদের বিদায়ের কারণে সে সত্যের মৃত্যু ঘটবে না। মহাসত্যের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখার মৃত্যু নেই। যে আদর্শের বীজ সত্যের বাহকেরা বপন করে যান, তার অঙ্কুরোদগম সত্যের বাহকদেরকে হত্যা করে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সময়ের ব্যবধানে তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে মহীরুহ ধারণ করবেই। ইসলামী আদর্শবাদী দলকে নিষিদ্ধ করে বা ইসলামী ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে আদর্শকে হত্যা করা যাবে না, এ কথাই যেন শাহাদাতের পূর্বক্ষণে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলে গেলেন।

দাফন কাফনের সময় হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। হাত দুটো নেই। তিনি হাত দুটো দিয়ে মহাসত্যের পতাকা ধারণ করেছিলেন, এ অপরাধে শত্রুরা তাঁর হাত দুটো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাঁর পবিত্র শরীরে রয়েছে জোড়াতালি দেয়া শতছিন্ন পোষাক। সে পোষাকও রক্ত আর বালিতে বিবর্ণ। তবুও তাঁর গোটা মুখমন্ডল দিয়ে যেন জান্নাতের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল হযরত মুসআবের এই করুণ অবস্থা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না।

সাহাবাগণ নীরবে চোখের পানি ফেলছিলেন, রাসূলের চোখে পানি ঝরতে দেখে সাহাবাগণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত ছোট এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে কাপড় দিয়ে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত থাকে, মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত থাকে। তিনি ছিলেন মক্কার ধনীর আদোরের দুলাল। তাঁর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মত জাঁক-জমক পূর্ণ পোষাক আর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করতো না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আর ধন সম্পদের পাহাড়কে পদাঘাত করে রাসূলের আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূল্যবান পোষাক ব্যবহার করা ছিল তাঁর অভ্যাস। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র আকর্ষণীয় গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতো। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর মা ছিল ইসলামের শত্রুদের দলে। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে বন্দী করে রাখতো। অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম দূত হিসাবেই তাঁকে মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দেয়ার একক কৃতিত্ব যেন তাঁরই। একমাত্র ঈমানই তাঁকে এই দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলো।

হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক। সুন্দরী তন্বী তরুণী এক ষোড়শীকে তিনি সবেমাত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। সেদিন ছিল তাঁর বাসর রাত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাসর রাত

অতিবাহিত করেছেন। ফরজ গোছল আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন হযরত হানযালা। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন ওহুদের রণপ্রান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাতিল শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ফরজ গোছল উপেক্ষা করে তরবারী হাতে ওহুদের ময়দানের দিকে ছুটলেন। আল্লাহর এই ব্যঘ্র 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে শত্রুবাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করতে থাকলেন। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। সুন্দরী তন্বী তরুণী স্ত্রীর সাথে বাসর শয্যার কোনো মধুর স্মৃতিই হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিহাদের ময়দান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। স্ত্রীর মধুর আলিঙ্গনের চেয়ে তিনি বাতিল শক্তির রক্তলোলুপ তরবারীর নিষ্ঠুর আলিঙ্গনকেই অধিক পছন্দ করেছিলেন। যুদ্ধ অবসানে আল্লাহর রাসূল শহীদদের দাফন করছেন। এমন সময় হযরত হানযালার সদ্য বিবাহিতা-বিধবা স্ত্রী যুদ্ধের ময়দানে এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আমার স্বামীর ওপর গোছল ফরজ ছিল, তাঁকে গোছল ব্যতীত দাফন করবেন না।'

আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের সন্ধান করবেন, এ সময়ে হযরত জিবরাঈল এসে নবীকে অবগত করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাকে গোছল দেয়ার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এত খুশী হয়েছেন যে, জান্নাতে তাঁর গোছলের ব্যবস্থা করেছেন।'

আল্লাহর রাসূল সাহাবাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিলেন। উপস্থিত সাহাবাগণ হযরত হানযালার লাশের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আর মাথার চুল ও মুখের দাড়ি থেকে সুগন্ধ যুক্ত পানি ঝরছে। ঈমানের টানে পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণের মাথায় পদাঘাত করে হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর এই উত্তম কর্মের পুরস্কার কিভাবে দান করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তা ওহুদের রণক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিল।

পৃথিবীতে যারা ইসলামের মুজাহিদ নামে পরিচিত, তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত শাহাদাত বরণ করা। সাফল্যের শেষ স্তর হলো শাহাদাত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ দানের মধ্যে যে কি তৃপ্তি তা ভাষায় প্রকাশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলামের প্রেমিক যারা তাঁরা শুধু হৃদয়ের সুষমা দিয়েই অনুভব করেছেন। শাহাদাত বরণ করার মধ্যে কি যে অপূর্ব স্বাদ, তা শহীদ ব্যতীত অন্য

কেউ অনুভব করতে পারবে না। ঈমানদারদের প্রাণ শাহাদাতের উদগ্র কামনায় ব্যাকুল থাকে। তাদের আত্মা শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী সুধা পান করার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনে। তাদের মন ছুটে চলে যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এক প্রভাময় পৃথিবীতে। সে পৃথিবীতে তাদের দেহ-মন জান্নাতের সুষমা মন্ডিত স্নিগ্ধ বারিধারায় অবগাহন করে।

ওহুদের রণপ্রান্তরে সত্য আর মিথ্যার মধ্যে রণদামামা বেজে ওঠার শব্দে মদীনার ইসলামী সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছিল শাহাদাতের জান্নাতি আবেশ। মুসলিম সমাজের যুবক, বৃদ্ধ, শিশু আর নারীরা তাদের দেহের তপ্ত রক্ত ইসলামের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। জিহাদের আহ্বান শুনে মদীনা নগরী এমনভাবে সজ্জিত হয়েছিল, যেন নববধু সুসজ্জিতাবস্থায় শরীরে সুগন্ধির প্রলেপ দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। মুসলমানদের ললাটে নবী প্রেমের দ্যুতি পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। হযরত আমর ইবনে জমুহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পঙ্গু। মসজিদে নববীর অদূরেই তিনি বাস করতেন। নবীর এই সাহাবী ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন তিনি। তবুও তিনি যুদ্ধে যাবেন। পিতার জিদ দেখে সন্তানগণ তাঁকে আটকিয়ে রেখে তাঁর চার সন্তান ওহুদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সন্তানগণ আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে আগ্রহী নয়। আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে এভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটবো।'

আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল হযরত আমরের সন্তানদেরকে বললেন, 'তোমাদের পিতা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা দিও না। হয়তো আল্লাহ তাঁকে শাহাদাত নছীব করবেন।'

হযরত আমরের চার সন্তান ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি তাঁর সন্তানদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, সন্তানদের চেহারায় শাহাদাতের তীব্র আকাংখা। রণসাজে সজ্জিত সন্তানদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের মতই দেখাচ্ছিল। হযরত জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সন্তানদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা ওহুদের পথে অদৃশ্য হলেন। তাঁর সন্তানগণ যদি শাহাদাত বরণ করে, তাহলে তাঁর আগেই তাঁরা আল্লাহর জান্নাতে যাবে। পঙ্গু পিতার বুকের

ভেতরটা কেমন যেন দোল খেলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, একজন কিশোর সাহাবী তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর দিকেই আসছে। কিশোর এসে তাঁর কাছে দোয়া কামনা করে ওহুদের দিকে চলে গেল। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে আর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।

আল্লাহর নবীর পঙ্গু সাহাবী হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের রণপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী বাহিনীর ভেতরে তিনি প্রবেশ করে বীর বিক্রমে আক্রমন করলেন। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর আশেপাশেই তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানগণ যুদ্ধ করছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে তাঁর চার সন্তান শাহাদাত বরণ করলেন। কাফেরদের শানিত অস্ত্র এক সময় তাঁর পঙ্গু দেহকে দ্বিখন্ডিত করে দিল। তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

হযরত আমর ইবনে জমুহর স্ত্রী স্বামীর এবং সন্তানদের লাশ গ্রহণ করার জন্য উট নিয়ে ওহূদের ময়দানে এলেন। লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে তিনি উটকে বাড়ির দিকে অগ্রসর করাতে চাইলেন। উট স্থির থাকলো। ওহূদের প্রান্তর ত্যাগ করতে উট রাজী হলো না। রাসূলকে এ কথা জানানোর পরে তিনি পঙ্গু সাহাবীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বামী বাড়ি থেকে আসার সময় কি কিছু বলেছিলো?

স্ত্রী জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিল, হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।

এ কথা শোনার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু সজল নয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নবুওয়্যতী দৃষ্টি শুভ্র মেঘমালা পার হয়ে ঐ দূর নীলিমা ভেদ করে সপ্তম আসমানের ওপরে আল্লাহর আরশে আজিমের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। অপূর্ব মধুময় স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দিল রাসূলের পবিত্র অধরে। উন্মুক্ত দক্ষিণা মলয় সমিরণে দোল খাওয়া কচি লতার মতই রাসূলের মাথা মোবারক সামান্য হেলে উঠলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। তাঁকে ওহুদের ময়দানেই অন্তিম শয়নে শুইয়ে দাও।' রাসূলের আদেশ অনুসারে হযরত আমর ইবনে জমুহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ওহুদের রক্তাক্ত উপত্যকায় অন্তিম শয়নে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। ঈমান এভাবেই তাঁর ভেতরে শাহাদাতের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো।

ওহুদের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকজন নারীও ছিল। তাঁরা সৈন্যদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদেরকে সেবা-যত্ন করতেন। তাঁরা মশক ভর্তি করে পানি এনে সৈন্যদেরকে পান করাতেন এবং পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় মশক ভর্তি করে আনতেন। সৈন্যদের ক্ষতস্থানে তাঁরা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। মুসলিম বাহিনী যখন হঠাৎ শত্রুবাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়ে পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন হযরত উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আহত সৈন্যদের সেবা করায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন শত্রু বাহিনী চিৎকার করে বলছে, 'কোথায় মুহাম্মাদ! তাঁর সন্ধান করতে থাকো, সে জীবিত থাকলে আমরা কেউ বিপদ মুক্ত নই। তাঁকে হত্যা করতেই হবে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত উম্মে আম্মারা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন আল্লাহর রাসূল যেখানে অবস্থান করছেন, সেদিকে শত্রুবাহিনী শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে যাচ্ছে। তিনি কোমল দেহের অধিকারী একজন নারী, তবুও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। নিজের প্রাণ শেষ হয়ে যায় যাক, কোন আফসোস নেই। তাঁদের মত শত কোটি জীবনের তুলনায় আল্লাহর রাসূলের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। রাসূলকে এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।

হযরত উম্মে আম্মারা হাত থেকে পানির পাত্র সজোরে নিক্ষেপ করলেন। যৎ সামান্য যে অস্ত্র হাতের কাছে পেলেন তাই উঠিয়ে নিয়ে উল্কার গতিতে রাসূলের সামনে উপস্থিত হলেন। একটা ঢাল যোগাড় করে তিনি শত্রুর আক্রমন প্রতিরোধ করতে লাগলেন। শত্রুর আক্রমন এতটা তীব্র ছিল যে, অনেক বিখ্যাত মুসলিম বীরও ময়দানে টিকে থাকতে পারেননি। অথচ এ ধরনের মারাত্মক এবং নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত উম্মে আম্মারা অতুলনীয় বিক্রমে শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন।

তিনি তীর বেগে ছুটে একবার ডানে এবং আরেকবার বামে যাচ্ছিলেন, যেন শত্রুবাহিনীর কেউ রাসূলের কাছে যেতে না পারে। তাঁর দুটো সন্তানও ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করছিলেন। শত্রুপক্ষ যখন দেখলো, এই নারীর কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছা যাচ্ছে না, তখন তারা হযরত উম্মে আম্মারার ওপরে আক্রমণ চালালো। একজন কাফির তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তরবারীর আঘাত করলো। হযরত উম্মে আম্মারা সে আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিহত

করলেন। তারপর তিনি তরবারীর আঘাত করে কাফিরের ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। ঘোড়া মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শত্রু সৈন্যও মাটিতে পড়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে হযরত উম্মে আম্মারার দুই সন্তানকে তাঁদের মা'কে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে শত্রুকে জাহান্নামে প্রেরণ করলো।

এক পর্যায়ে তাঁর সন্তান আহত হলো। কলিজার টুকরা সন্তানের রক্তাক্ত দেহ দেখেও মায়ের মধ্যে সামান্য ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো না। সন্তানকে তিনি কোনো ধরনের সান্ত্বনার বাণীও শোনালেন না। তিনি নির্বিকার চিত্তে সন্তানের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে আদেশ দিলেন, 'দ্রুত ময়দানে গিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

আল্লাহর রাসূল তাঁর এই মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আম্মারার সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেই তিনি বারবার মহান আল্লাহর কাছে তাঁর এই মহিলা সাহাবীর জন্য দোয়া করছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে হযরত উম্মে আম্মারার সামনে এলো ঐ ব্যক্তি, যে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে আঘাত করেছিলো। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করার লক্ষ্যে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁকে সতর্ক করে বললেন, 'হে উম্মে আম্মারা ! সতর্ক হও ! এই জালিম তোমার সন্তান আব্দুল্লাহকে আহত করেছে।'

নবীর কথা শুনে হযরত উম্মে আম্মারার শরীরে যেন সিংহের শক্তি এসে জমা হলো। তিনি তরবারি দিয়ে পুত্রের ওপর আঘাতকারীর ওপরে এমন শক্তিতে আঘাত হানলেন যে, তাঁর আঘাতে শত্রু সৈন্য দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মক্কার কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বীর জাহান্নামী আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়ার সাথেও হযরত উম্মে আম্মারা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যুদ্ধ করেছিলেন। ইবনে কামিয়াহ বারবার রাসূলকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছিল। সেই কঠিন মুহূর্তে হযরত উম্মে আম্মারার মত একজন কোমল দেহের নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে ইবনে কামিয়াকে প্রতিরোধ করছিলেন। আক্রমনকারী জালিমের দেহ ছিল লৌহ বর্মে আবৃত। হযরত উম্মে আম্মারা জালিমকে হত্যা করার জন্য তরবারির আঘাত করেন। কিন্তু জালিমের দেহে বর্ম থাকার কারণে হযরত উম্মে আম্মারার তরবারি ভেঙ্গে গেল। জালিম এবার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর এই বাঘিনীর ওপর আক্রমন করলো। তিনি ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করতে গিয়েও কাঁধে মারাত্মক আঘাত পেলেন।

কিন্তু রাসূলের এই মহিলা সাহাবী সামান্যতম কাতর হলেন না। আহত দেহ নিয়েই তিনি আল্লাহর দুশমনের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখলেন। তাঁর মোকাবেলায় টিকতে না পেরে জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ইসলামের এই বঘিনীর কোমল শরীরে ইসলামের শত্রুরা ১২ স্থানে আঘাত করেছে। এতগুলো আঘাত পাওয়ার পরও তিনি যুদ্ধে বিরতি দেননি। আল্লাহর রাসূলকে অক্ষত রাখার জন্য তিনি নিজের প্রাণের কোন পরোয়া করেননি। মৃত্যুকে তাঁরা পায়ের ভৃত্য মনে করতেন। তাঁরা শহীদী মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াতেন।

পৃথিবীর বুকে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুধুমাত্র পুরুষই ময়দানে রক্ত দান করেনি। মুসলিম নারীগণ কোন দিক থেকে কোন অংশেই পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা ইসলামের জন্য স্বামীকে, সন্তানকে, ভাইকে, পিতাকে, নির্বিশেষে নিজের প্রিয় প্রাণও উৎসর্গ করেছে। আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সামান্যতম কার্পণ্যতা প্রদর্শন করেনি আর ঈমানী শক্তিই তাঁদেরকে এই পথে অগ্রসর করিয়েছিলো।

মূতার যুদ্ধে ঈমানদারদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিন হাজার। এক সময়ের ক্রীতদাস, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তানের সতই দেখতেন। সেই শিশুকাল থেকেই তিনি নবীর সাহচর্যে রয়েছেন। তিনি ছিলেন হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু । তাঁকেই ঈমান দীপ্ত বাহিনীর প্রথম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই একজন করে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করা হতো। এই যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনাপ্রধান আল্লাহর রাসূল নিযুক্ত করলেন। বিষয়টা ছিল অন্য যুদ্ধের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। দ্বিতীয় প্রধান করা হলো হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে। তৃতীয় প্রধান করা হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে।

আল্লাহর নবী ঘোষনা করলেন, 'যায়িদ শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে জাফর, জাফর শাহাদাতবরণ করলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে আব্দুল্লাহ। সে-ও যদি শাহাদাতবরণ করে তাহলে মুসলিম বাহিনী যাকে ইচ্ছা তাকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করবে।' কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ইহুদী আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে মন্তব্য করেছিলো, 'খোদার শপথ! এই তিনজনই আজ শাহাদাতবরণ করবে।'

মুসলিম বাহিনী সিরিয়া প্রদেশে উপনিত হয়ে জানতে পারলো, তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য শোরহাবিল এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে এবং আরো এক লক্ষ সৈন্য তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দক্ষতার সাথে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে এক সময় তিনি শাহাদাতের সুধা পান করলেন। এরপর হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পতাকা হাতে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একলক্ষ বাহিনীর সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্যর এক অসম যুদ্ধ হচ্ছে। হযরত জাফরের ঘোড়া আহত হলো। শত্রু পক্ষ তাঁর বাম হাত কেটে দিলে তিনি ডান হাতে পতাকা তুলে ধরলেন। ডান হাত কেটে দিলে তিনি কাটা বাহু দিয়ে পতাকা উড্ডীন রাখলেন। এরপর তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মুখ দিয়ে পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাঁকে জান্নাতে এমন দুটো পাখা দান করা হয়েছে যে, সে পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।'

এবার এগিয়ে এলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারি চালনা করতে করতে তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। একজন সাহাবী তাঁকে এক টুকরা গোস্ত দিয়ে বললেন, 'আপনি বড় ক্ষুধার্ত, এই টুকু খেয়ে তরবারি চালনা করুন।' গোস্তের টুকরা তিনি মুখে দিয়েছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, একজন মুসলিম সৈন্য বড় বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। তিনি গোস্তের টুকরা ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার জন্য এ পৃথিবীতে খাবারের কোনো প্রয়োজন আর নেই।' হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গোটা দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি তাঁর শরীরে তরবারী এবং বর্শার ৯০ টি আঘাত দেখেছি। সমস্ত আঘাতগুলো ছিল সামনের দিকে।'

এই যুদ্ধের সংবাদ আল্লাহর নবীকে মদীনাতেই ফেরেশতার মাধ্যমে দেয়া হচ্ছিলো। কে কখন শাহাদাত বরণ করছেন, তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে শোনাচ্ছিলেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূলের সামনে যেন মৃতার প্রান্তর তুলে ধরা হয়েছিল। যুদ্ধের দৃশ্য দেখে দেখে তিনি বর্ণনা করছিলেন। যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন হযরত ইয়ালী ইবনে মাম্বাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনন্থ। তিনি সংবাদ বলার আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তুমিই সংবাদ বলবে না আমি তোমাকে শোনাবো?' তিনি রাসূলের মুখ থেকে যুদ্ধের ঘটনা শুনে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি বাড়িয়েও বলেননি কিছু কমও বলেননি।' ঈমানী চেতনা তাঁদের মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছিলো।

ঈমান জীবনের বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো

একজন বেদুঈন ঈমান এনে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে হিজরত করতে আগ্রহী।' খয়বরের যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় আল্লাহর রাসূল সেই বেদুঈনের অংশ পৃথক করে রাখলেন। তাঁকে যখন তাঁর অংশ দেয়া হলো তখন তিনি জানতে চাইলেন, 'এ সম্পদ তাঁকে কেনো দেয়া হচ্ছে?' তাঁকে জানানো হলো, 'এটা তোমার প্রাপ্য অংশ।' সেই বেদুঈন সম্পদের অংশ হাতে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সম্পদের আশায় ঈমান আনিনি। আমি ঈমান এনেছি যেন আমার কণ্ঠে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়, আমি শাহাতাদবরণ করি এবং জান্নাতে যেতে পারি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তোমার চুক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করবেন।' যুদ্ধ শেষে সেই বেদুঈনের লাশ যখন পাওয়া গেলো, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তাঁর চুক্তি সঠিক ছিলো, আল্লাহও তাঁর আশা পূরণ করেছেন।' এসব লোকগুলো ঈমান আনার পূর্বে কী বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই না করছিলো! তাঁরা কোনো নিয়ম-পদ্ধতি, জীবন বিধানের পরোয়া করতো না এবং কোনো শক্তির আনুগত্যও করতো না। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করতো, তারা সেদিকেই ছুটে যেতো। ভ্রান্তির বেড়াজালে ছিলো তারা বন্দী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

তাঁরা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করতেন। তাঁরা

পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দিয়েছিলো। মহান আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে ঈমানের রঙে রঙিন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ, শক্তি-মত্তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার মালিক মনে করতেন না এবং এগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারও করতেন না। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা, অনুরাগ-বিরাগ, লেন-দেন, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অধীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ঈমানের দাবি অনুসারে স্পন্দিত হতো। তাঁরা নিশ্বাস গ্রহণ করতেন ঈমানের দাবি অনুসারে এবং তা ছাড়তেনও ঈমান নির্দেশিত পন্থায়। ঈমানের বিপরীত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা জাহিলিয়াতের ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা ঈমানের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। একদিকে মানুষের প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মহান আল্লাহর গোলামী। তাঁরা অুনধাবন করেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীকে কবুল করতে হবে। আমি যখনই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখনই আমার আমিত্ব বা মতামত বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোনো কাজ আর করা যাবে না। ঈমান আনার পরে আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই।

ঈমান আনার পরে রাসূলের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। ঈমানের বিপরীত বিধানের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না বা নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় সমাজ ও দেশে প্রচলিত কোনো প্রথার অনুসরণ করা যাবে না। ঈমান আনার পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না বা আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকা যাবে না। এসব দিক তাঁরা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যখনই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তখনই জাহিলিয়াতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ,

নীতি-পদ্ধতি ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করেছিলেন–ফলে তাঁদের জীবনে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। ফুযালা নামক এক ব্যক্তি রাসূলের হাতে হাত দিয়ে ঈমান আনার পরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে এক মহিলার সম্পর্ক ছিলো। পথে সেই মহিলার সাথে দেখা হলে মহিলা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত ফুযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'এখন আর সেই সুযোগ নেই, আমি ঈমান এনেছি–আমি আল্লাহর গোলাম, এখন আর তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো অবকাশ নেই।'

ঈমান তাঁদের মধ্যে মানবতার সকল শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও দৃশ্যমান করেছিলো। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানে নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তাঁরা শাসক হিসাবেই থাকুন অথবা রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী হিসাবে, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, বিনয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখতে পাওয়া যেতো। প্রতিপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো, 'রাতে তাঁদেরকে দেখতে পাবে যেন পৃথিবীর সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো কাজই নেই।

আর দিনের বেলা দেখতে পাবে, রোযাদার হিসাবে ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে। তাঁরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য প্রদান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে, শত্রুকে পরাজিত করেই যুদ্ধে বিরতি দেয়। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এবং মনে হবে যে, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করাই যেন তাঁদের একমাত্র কাজ।' ঈমান এভাবেই তাঁদের গোটা জীবনে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করেছিলো।

ধৈর্যশীলদের প্রধান দুটো গুণ

কোরআনুল কারীমে ঈমানদারদের দল তথা দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের দুটো গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এরা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ উদ্দিপনা দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এরা একজন আরেকজনের প্রতি দয়া-মায়া, সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রেরণা দিয়ে থাকে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একজন মুমিন তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামীর গোটা জীবনই ধৈর্য অবলম্বনের জীবন। ঈমান আনার সাথে সাথেই তাকে ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয়। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে ফেরাউনের যাদুকররা যখন ঈমান আনলো এবং সেই সাথে সাথে তাদের ওপরে যে কঠিন পরীক্ষা নেমে এলো, অসীম ধৈর্যের সাথে তারা সেই ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পৃথিবী থেকে ঈমান নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছিল।

সুতরাং ঈমান আনার সাথে সাথেই ঈমানদারকে সমস্ত কিছুতেই অসীম ধৈর্য ধারণ করতে হয়। মহান রব আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ পালন করার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, নিজের প্রবৃত্তিকে অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, চরম দরিদ্রতার মোকাবেলা করে অবৈধ অর্থ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন। দ্বীনি আন্দোলন থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তি লোভ-লালসা দেখিয়ে থাকে, তাদের পাতা ফাঁদে পা দিলে পৃথিবীর জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। এই ঘৃণ্য পথ থেকে বিরত থাকতে গেলে ধৈর্যের প্রয়োজন। একমাত্র আল্লাহর গোলামী করার কারণে বাতিল শক্তি জুলুম নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে দেয়, এই কঠিন অবস্থাতেও ধৈর্যের প্রয়োজন। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, ঘৃণা, অর্থ-সম্পদ, দৈহিক শক্তি, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি বার বার অন্যায় পথে ধাবিত হতে থাকে, এসব কিছুকে অন্যায় পথ থেকে বিরত রেখে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করারও অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন।

ধৈর্যের এই প্রশিক্ষণ একাকী নির্জনে গ্রহণ করাও যায় না এবং একাকী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য নামক দুর্লভ গুণ সৃষ্টিও হয় না। ঈমানদার ব্যক্তি যখন দলবদ্ধভাবে, একটি আন্দোলনে–সংগঠনে অবস্থান করে, সেখান থেকেই সে

প্রশিক্ষণ লাভ করে। এই ব্যক্তি যখন দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর ভেতরে প্রতিটি ব্যাপারে অসীম ধৈর্যের নিদর্শন দেখতে পায়, স্বাভাবিকভাবেই তার ভেতরে ঐ গুণ সংক্রামিত হয়। এই ব্যক্তি যখন একাকী কোন বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন তার ভেতরে সংক্রামিত সেই গুণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইসলাম বিরোধী শক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন নির্জন ফাঁসি কক্ষে ফাঁসির রশি কণ্ঠে পরিয়ে দেয়, তখন অসীম ধৈর্যের সাথে বলতে থাকে, 'আমি কোথায় কি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম, এটা আমার দেখার বিষয় নয়–আমি আল্লাহর গোলাম হিসাবে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছি, এটাই আমার জীবনের সবথেকে বড় সফলতা।'

দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, মায়া-মমতা, বদান্যতা ও সহানুভূতি। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারদের সমন্বয়ে যে দল, সমাজ ও জাতি গড়ে ওঠে, এরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়। একে অপরের প্রতি মমতা ও করুণা প্রবণ হয়। আর্তমানবতার সেবায় এরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। এই দুর্লভ গুণও সৃষ্টি হয় ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে। ব্যক্তি যখন নিজেকে এই দলে শামিল করে তখন সে দেখতে পায়, সংগঠনের প্রতি নেতা-কর্মী একে অপরের সাথে অত্যন্ত মমতা প্রবণ। একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে মমতা সিক্ত ভাষায়। এদের আচরণে ও কথায় কঠোরতার কোন স্থান নেই। মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসি জড়িয়ে রয়েছে পরস্পরের ঠোঁটে। মমতার আদ্রতাপূর্ণ এই আচরণ ঐ ব্যক্তির চরিত্রেও সংক্রামিত হয়। সে একাকী যখন অন্যের সাথে আচরণ করে, তখন তার আচরণে মমতার প্রকাশ ঘটে।

বস্তুত ইসলামী দল ও এই দলের সংগ্রামের ফলে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরেই মমতার ফল্গুধারা বইতে থাকে। গোটা জাতি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে শাসক হিসাবে না পেয়ে কর্তব্য পরায়ণ–সেবাপরায়ণ সেবক পেয়ে থাকে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলে রাষ্ট্রের একজন খৃষ্টান কর্মচারী তাঁর কাছে একদিন নিজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদন পত্র দিয়েছিল। প্রায় একমাস পরে ইসলামী সাম্রাজ্যের কর্ণধার গেলেন খৃষ্টানদের গির্জা পরিদর্শনে। সেখানে ঐ খৃষ্টান কর্মচারী খলীফার সাথে দেখা করে বললেন, 'আমি সেই খৃষ্টান যুবক–এই রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী। আমি আমার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় একমাস পূর্বে আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম।'

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতাপশালী শাসক হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টান যুবকের দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'আমিও ওমর–সেই মুসলমান। তোমার আবেদন পত্র সেই মুহূর্তেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে যথাস্থানে প্রেরণ করেছি। আগামী মাসের প্রথম তারিখ থেকেই তুমি তোমার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।' এই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারের মমতাসিক্ত আচরণ।

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।'

বোখারী শরীফে এসেছে, 'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে অন্যায় অবিচার করে না, তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণের কাজে নিযুক্ত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে কিয়ামতের বিপদসমূহের মধ্যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'

একজন আরেকজনের দোষ-ত্রুটি গোপন তখনই রাখে, যখন সে তার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হয়, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। আবু দাউদ ও তিরমিজী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দয়া-মায়াপ্রবণ লোকদের ওপরে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করুণা করে থাকেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর ওপরে দয়া করো, তাহলে আকাশ ওয়ালা (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।'

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজে দয়া করে না, তার প্রতি অন্য কেউ দয়া করে না।' পরস্পরের প্রতি সালামের রীতি, ছোটদেরকে স্নেহ করার নীতি ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করার রীতি ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এবং ইসলামী সংগঠন এসবের প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে এই ভাবধারা প্রবর্তন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া ও স্নেহ

করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।' তিনি আরো বলেছেন, 'তিন ধরনের লোক জান্নাতে গমন করবে। তার মধ্যে এক ধরনের লোক হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজের আত্মীয় ও মুসলমানদের জন্যে দয়াশীল ও নমনীয় হয়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'একজন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ব্যক্তির জন্যে এক প্রাচীরের মতো। এই প্রাচীরে প্রতিটি অংশ অপর অংশকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে রাখে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাস ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি অখন্ড শরীরের মতোই দেখতে পাবে। যেমন শরীরের একটি অঙ্গে কোন ব্যথা দেখা দিলে সেই ব্যথা সমস্ত শরীরে সংক্রামিত হয়, মুমিনদের অবস্থাও অনুরূপ হয়। কেউ একজন বিপদগ্রস্ত হলে, সবাই সেই বিপদে এগিয়ে আসে।'

এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মুসলিম সমাজ। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই ব্যক্তিকে ঈমান আনার পরেই ইসলামী সমাজ গড়ার কাজে শামিল হতে হয়। আর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার কাজে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। ঈমানের দাবি অনুসারে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণের লক্ষ্যে ঈমানদারকে ইসলামী সংগঠনে শামিল হতে হবে। এ জন্যে ইসলামী সংগঠন থেকে দূরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়না, পরিশেষে আদালতে আখিরাতে তার পক্ষে কল্যাণ লাভ করাও কঠিন হয়ে পড়বে।

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাচ্ছির
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি
কর্তৃক রচিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা ফাতিহা, সূরা আল-আসর, সূরা লুকমান, আমপারার
তাফসীরসহ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ

১. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
২. মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন
৩. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
৪. আল-কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা
৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা
৬. দ্বীনে হক-এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
৭. বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন- ১ ও ২
৮. মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
৯. আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি
১০. আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
১১. হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
১২. শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
১৩. কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়?
১৪. জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
১৫. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মোনাজাত
১৬. আল্লাহ কোথায় আছেন?
১৭. আখিরাতের জীবনচিত্র
১৮. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল : ০১৭১-২৭৬৪৭৯